মুহাম্মদ আসাদ

বাংলা যেভাবে ভাগ হলো

বাংলা যেভাবে ভাগ হলো

মুহাম্মদ আসাদ

কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

একটি কৃষ্ণচূড়া প্রকাশনা

বাংলা যেভাবে ভাগ হলো
মুহাম্মদ আসাদ
১৮ পশ্চিম মাটিকাটা
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬
মোবাইল ঃ ০১৭২২০৬৬৮৮৫

প্রকাশক
আজিজুন নাহার মঈন
১১১, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৯৬৬২৬৮১

প্রথম মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ইং
ফাল্গুন ১৪১৫ বাংলা

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোঃ গোলাম হোসাইন মজুমদার নয়ন

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
হক প্রিন্টার্স
২১০, ফকিরাপুল (কালভার্ট রোড), ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ০৬৬৬২৬২৬৩৬৯

মূল্য
২০০ টাকা মাত্র

Bangla Jebhabe Bhagh Holo, written by Muhammad Asad &
Published by Azizun Nahar Moin, Krishnachura Prokashoni,
111 Central Road, Dhanmondi, Dhaka-1205, First Addition
February 2009.
Price Tk. 200 $ 5 Dollar
ISBN : 984-70198-0016-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পিতা

মোঃ আব্দুর রশিদ (৮৬)-এর

(মৃত্যুঃ ৮ এপ্রিল ২০০৬, ২৫ চৈত্র ১৪১২, শনিবার সকাল ৮.০৫ মিঃ)

আত্মার মাগফিরাত কামনায়

–লেখক

www.pathagar.com

যাঁদের সহযোগিতায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো

১. জনাব খোদাদাদ আহমেদ
২. কবি মোহসেনা খাতুন
৩. কবি আমেনা খাতুন
৪. জনাব এম. এ মামুন
৫. প্রকৌশলী এম আজিজুল ইসলাম
৬. জনাব এ.টি.এম সিরাজুল হক
৭. উম্মে জাহান আরজু
৮. মোঃ গোলাম হোসাইন নয়ন
৯. ডাঃ এম.এ মুক্তাদীর
১০. মোঃ আবুল হোসেন
১১. মোঃ আবদুস শুক্কুর

www.pathagar.com

আমার কথা

১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগ হয়েছে। ঐতিহাসিক পর্যালোচনার দ্বারা একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলা ভাগের পেছনে এই পাঁচ জন রাজনীতিবিদ প্রধান ও প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে পালন করেছেন ঃ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, আচার্য কৃপালনি, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মহাত্মা গান্ধী। হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু, ড. কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ বাংলাকে অখন্ড ও স্বাধীন রাখতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ অখন্ড বাংলাকে সমর্থন করেছেন পুরো অঞ্চলটিকে পাকিস্তানে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলাকে অখন্ড রাখার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। এমনকি তিনি সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজের অখন্ড বাংলার প্রতি সমর্থন ছিল। ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আচার ব্যবহার এক থাকায় সাধারণ হিন্দুরাও মনে প্রাণে বাংলা বিভাগ চায়নি। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের ৫৮ জন আইন পরিষদের সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন (পরিশিষ্ট-৭ দ্রষ্টব্য)। ফলে অবিভক্ত বাংলা বিভক্ত হয়। একভাগ 'পশ্চিম বঙ্গ' নামে একটি প্রদেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং অপর ভাগ পূর্ব বাংলা নামে একটি প্রদেশ হিসেবে 'পাকিস্তান'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমবাংলার একজন মুসলিম সদস্যও বাংলা-বিভক্তির পক্ষে ভোট দেননি। সেদিন যদি আইন পরিষদের হিন্দু-মুসলিম সদস্যগণ একত্র হয়ে ঘোষণা করতেন আমরা জিন্নাহ-নেহেরু-গান্ধী বুঝিনা, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান বুঝিনা, আমরা বুঝি অখন্ড স্বাধীন বাংলা। তাহলে বাংলা ১৯৪৭ সালেই স্বাধীন হতো। ভাষার জন্য পূর্ববাংলার জনগণকে আন্দোলন করতে হতোনা কিংবা ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ৩০ লক্ষ লোককে প্রাণ বিসর্জন দিতে হতো না। এমনকি অখন্ড বাংলা যদি পাকিস্তানেরও অন্তর্ভুক্ত হতো পশ্চিম পাকিস্তানই বাংলাদেশের উপনিবেশে পরিণত হতো, আমরা ১৯৭১ সালের ১০ বছর আগেই স্বাধীন হতাম। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কোন দূরদর্শী নেতা না থাকায় বাঙালিদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলায় দেড়কোটি হিন্দু বসবাস করতো। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীরা সেদিন কি পূর্ববাংলার হিন্দুদের কথা চিন্তা করেছিলেন? তাদের ভবিষ্যৎ কি, তারা কি জন্মভূমিতেই থাকবে নাকি পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি জমাবে? অবাঙালি নেহরুর নির্দেশ বাংলা কংগ্রেসকে মানতে হয়েছে। নেহেরুর উপর দিয়ে টু-শব্দ করার কারো ক্ষমতা ছিলনা। শরৎবাবু ঠিকই সেদিন তার 'জাগরণ' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ হয়তো

www.pathagar.com

ভেবেছেন, বিভক্ত বাংলার হিন্দু-বাঙালি হয়তো স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে, কিন্তু এ স্বপ্ন মরীচিকা মাত্র। আইন পরিষদের হিন্দু সদস্যদের ও বাংলা কংগ্রেসের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার দিলে তাদের অধিকাংশ বাংলা বিভাগের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করতেন। বাঙালি হিন্দুর বুকের উপর হুকুম নামার পিস্তল ধরে মৃত্যু পরোয়ানা সই করে নেয়া হচ্ছে অথচ হিন্দু বাংলা টু শব্দটি করতে পারছেনা। সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও নেতাজীর জাতির কি সত্যিই এমনি অধঃপতন হয়েছে।"

১৯৪৭ সালের ২০ জুন কত সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সংসদের কক্ষে বসে মাত্র কয়েকজন হিন্দু-বিধায়ক (এম.এল.এ) বাঙালি জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করেছিলেন। তাদের কারণেই পূর্ববাংলার ৫০/৬০ লক্ষ হিন্দু-বাঙালি নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে বাস্তুহারা পরিচয়ে হিন্দুস্তানে হিজরত করেছে এবং অমানবিক-অসামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পাড়ি দিতে গিয়ে যারা সিঁথির সিঁদুর হারিয়েছে, যে সন্তান তার পিতা মাতাকে হারিয়ে এতিম হয়েছে, শ্মশান আর গোরস্তান ভরে উঠেছে যাদের লাশে, যারা পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় দেশান্তরী হয়ে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে, যারা বাঙালিত্ব হারিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মানবেতর জীবন যাপন করছে, তারা ঐ বিজ্ঞ বিধায়কগণকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। ইতিহাসের কাঠগড়ায় চিরদিন আসামী হয়ে থাকতে হবে। বঙ্গ-বিভক্তির পক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের যুক্তিসহ তফসিলি সম্প্রদায়, মুসলিম লীগ, বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর ভূমিকা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে উল্লিখিত রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অবদানকে কোনক্রমেই আমরা খাটো করে দেখিনি, দেখিনা। তবে বঙ্গ বিভক্তির ক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকার কথা সত্যনিষ্ঠ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে বেশ কিছু বই ও পুরানো পত্র-পত্রিকা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি। পশ্চিমবঙ্গের পথে প্রান্তরে ঘুরে বাঙালিদের অবস্থা অবলোকন করতে হয়েছে। আমি যতদূর সম্ভব সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছি। আমি মনে করি ১৯৪৭ সালের ঘটনাবহুল এ কাহিনীটি পড়ে বাঙালিরা প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারবেন।

এই বইটি লেখার ইচ্ছা আমার কোনদিনই ছিল না। একদিন শাহবাগে বাংলা ভাগ নিয়ে পূর্ণিমা বাসর-এর সাধারণ সম্পাদক ও নাট্য কর্মী প্রীতিভাজন ইসমত আরা চৌধুরী শান্তির সঙ্গে আমার তর্ক হয়েছিল। এই তর্কের ফসল 'বাংলা যেভাবে ভাগ হলো'। অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, মোর্শেদ আযম, মোঃ গোলাম হোসাইন মজুমদার নয়ন, মোঃ আহ্সান হাবিব সোহাগ প্রমুখ এ গ্রন্থটি লিখতে আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

–মুহাম্মদ আসাদ

www.pathagar.com

'কলকাতা ছাড়া বাংলার কি মূল্য আছে? তারা অর্থাৎ বাঙালিরা স্বাধীন ও অখন্ড থাকলেই ভালো।'

– মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

'জিন্নাহ সাহেব বাংলা বিভাগ এড়ানোর জন্য হিন্দুদের অনেক ছাড় দিতে রাজী ছিলেন। এমনকি বাংলাকে পাকিস্তানে না রাখার শর্তে বাংলাকে অখন্ড রাখতে চেয়েছিলেন। এতে যে তিনি খুশী হবেন তাও বিনাদ্বিধায় বলেছিলেন।'

–হুডসন (The Greate Divide)

'প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন, বিভক্ত বাংলার হিন্দু-বাঙালি হয়তো স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে, কিন্তু এ স্বপ্ন মরীচিকা মাত্র। আইন পরিষদের হিন্দু-সদস্যদের ও বাংলা কংগ্রেসের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার দিলে তাদের অধিকাংশ বাংলা বিভাগের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করতেন। বাঙালি-হিন্দুর বুকের উপর হুকুম নামার পিস্তল ধরে মৃত্যু পরোয়ানা সই করে নেয়া হচ্ছে অথচ হিন্দু-বাংলা টু-শব্দটি করতে পারছেনা। সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও নেতাজীর জাতির কি সত্যিই এমনি অধঃপতন হয়েছে।'

–শরৎচন্দ্র বসু

'বঙ্গ বিভাগের দ্বারা তফসিল জাতির সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতি হইবে। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুরা ধনী এবং অনেকেই চাকুরীজীবী, তাহারা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিবেন। কেবলমাত্র দরিদ্র তফসিল কৃষক, মৎসজীবী প্রভৃতি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পূর্ববঙ্গে থাকিবে। কাজেই তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে হইবে অথবা ধর্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা বাড়িয়া যাইবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তফসিলরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রীতদাসের মত চিরকাল জীবন-যাপন করিতে বাধ্য হইবে।'

-যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল

'যদা শ্রৌষং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও লক্ষীকান্ত মৈত্রেয় বাংলাদেশকে বিভক্ত করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।'

'যদা শ্রৌষং ১৯৪৭ সালে মুসলমান বাঙালির বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও হিন্দু বাঙালির ভোটে বাংলাদেশ বিভক্ত হইল, তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।'

(নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'আত্মঘাতী বাঙালি' গ্রন্থ থেকে)

www.pathagar.com

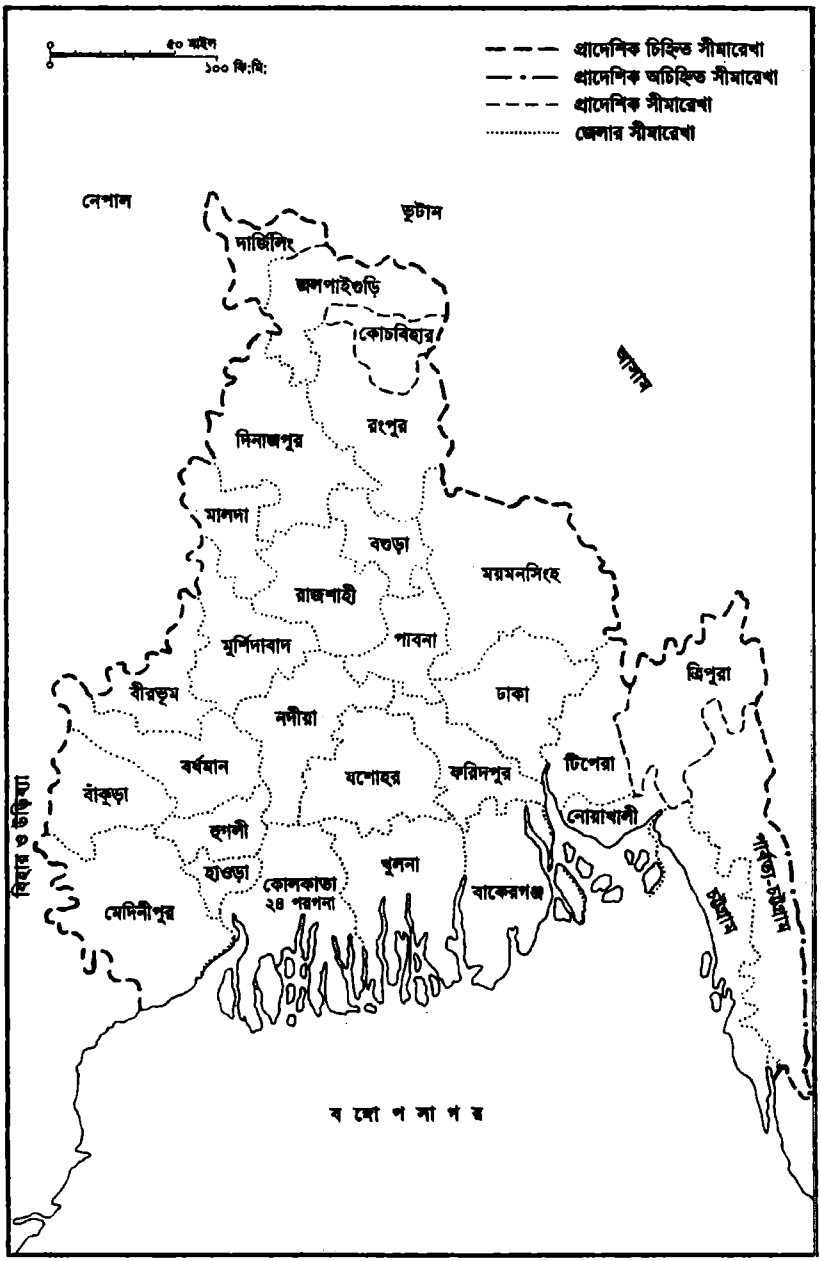

অবিভক্ত বাংলার জেলাসমূহ।

www.pathagar.com

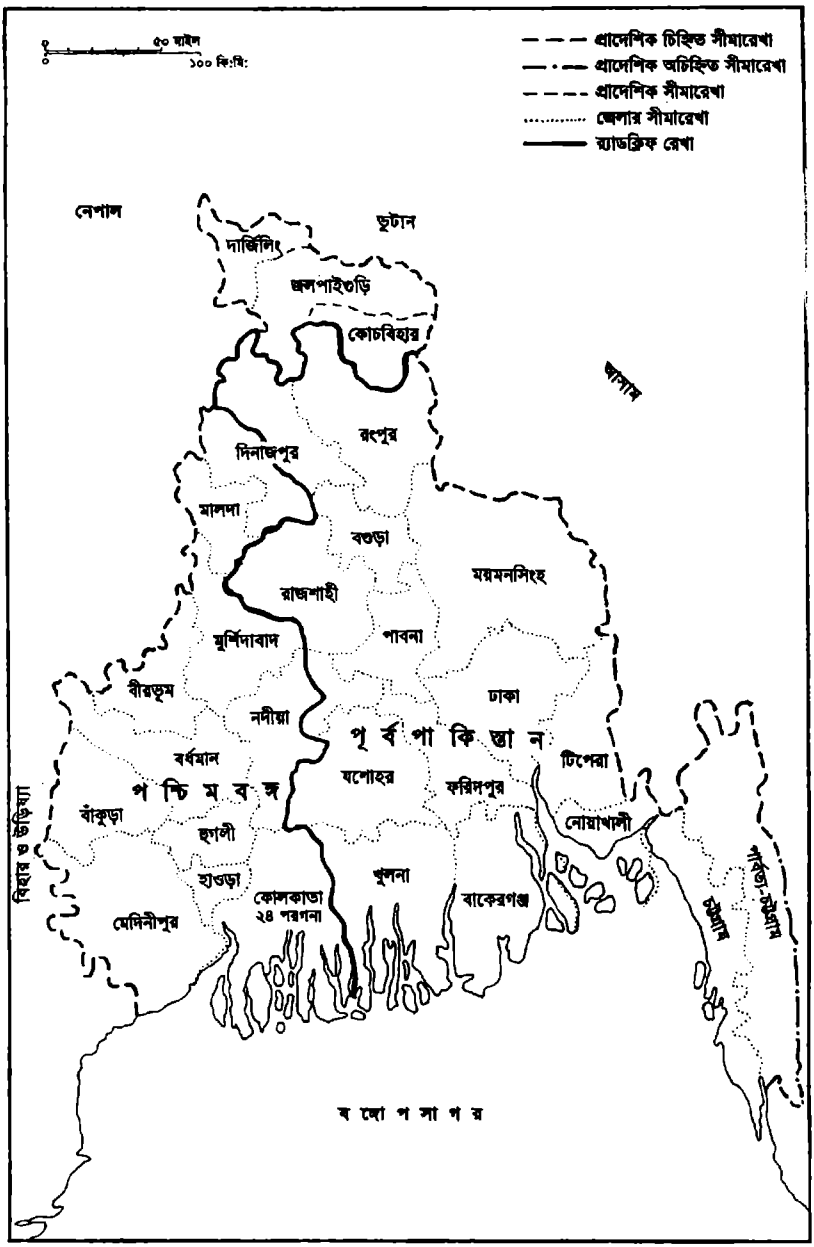

পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান। র‍্যাডক্লিফ রেখা।

www.pathagar.com

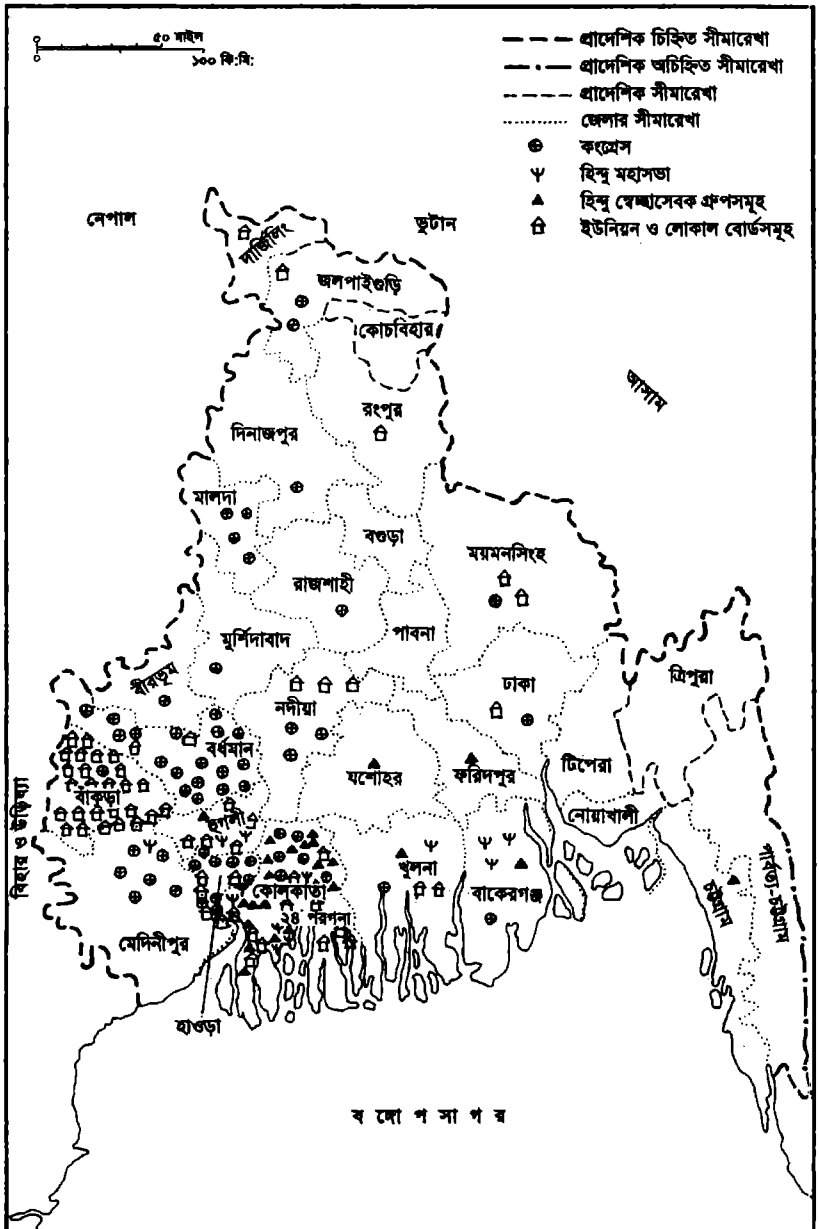

বিভাগের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি। *কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সভা অনুষ্ঠান।*

www.pathagar.com

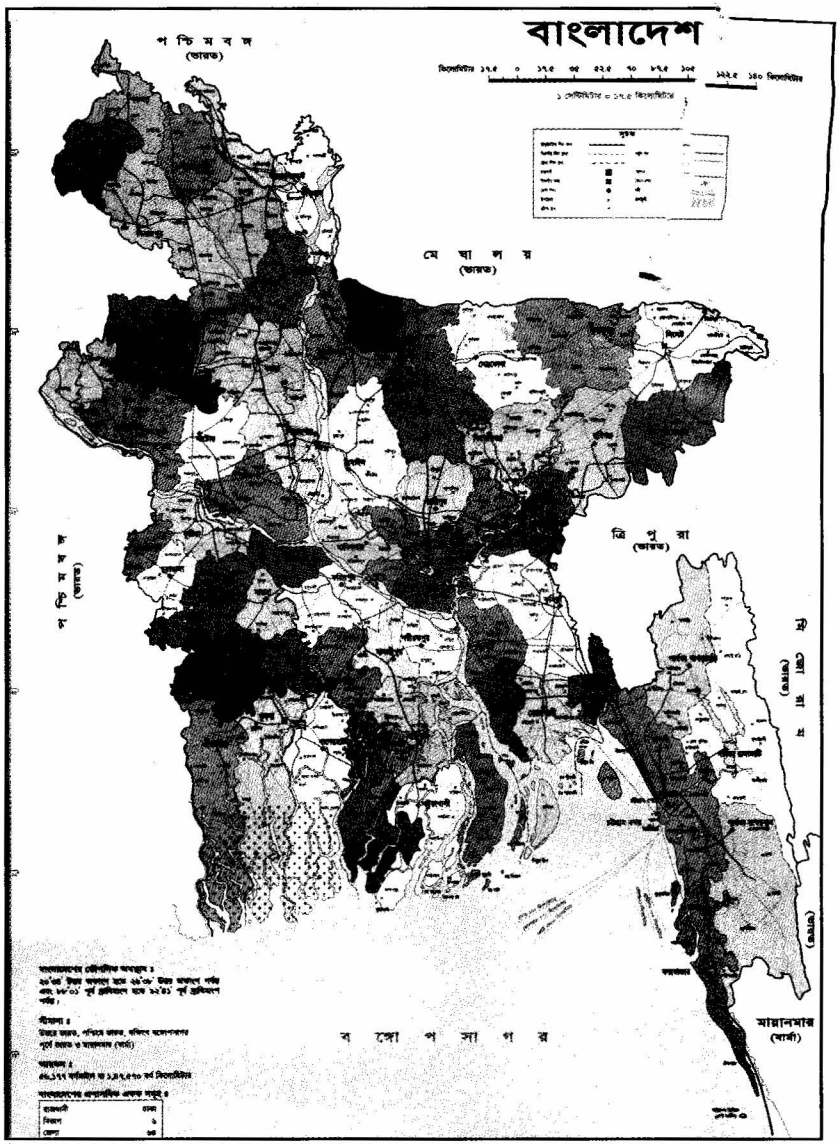

www.pathagar.com

সূচিপত্র

বাংলা ভাগের পটভূমি ১৩
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন ২৮
স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ ... ৭৪
অখন্ড স্বাধীন বাংলা ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৭৯
ধর্ম বিভাজনের ভিত্তিতে বাংলা বিভাগ ৮২
বাউন্ডারি কমিশন ৮৩
বাউন্ডারি কমিশনের কার্যাবলী ৮৬
বাংলা ভাগের সময় রাজনীতিবিদ ও বৃটিশ কর্মকর্তাদের ভূমিকা ৯২
বাংলা বিভাগের ঐতিহাসিক মুল্যায়ন ১১৩
পরিশিষ্ট ঃ
সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি ১১৮
আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি..... ১২২
বাংলার বিরুদ্ধাচরণের জবাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী..... ১২৭
বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয় ১৩২
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো .. ১৩৪
গান্ধী কর্তৃক শরৎ বসুকে লিখিত চিঠি ১৩৬
অখন্ড বাংলা ও নতুন গণপরিষদে যোগদানকারী ১২৬ জন বিধায়কের তালিকা ১৩৭
ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ৯০ জন বিধায়কের তালিকা ১৩৯
বাংলা ভাগের পক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ৫৮জন এবং বিপক্ষে ২১ জন ভোট প্রদানকারী বিধায়কের নাম ১৪১
বাংলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে ভোট প্রদানকারী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ১০৫ জন বিধায়কের নাম ১৪৩
বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট প্রদানকারী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ৩৫ জন হিন্দু বিধায়কের নাম ১৪৭
র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ ১৪৮

www.pathagar.com

বাংলা ভাগের পটভূমি

মহাকবি ইকবাল

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহাকবি ইকবাল মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। গোলটেবিল বৈঠক চলার সময় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী বৈঠকের প্রতিনিধিদের নিকট দাবী জানান যে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান নিয়ে পাকিস্তান (পবিত্র ভূমি) গঠন করতে হবে। এ প্রস্তাবে বাংলা ও আসামের কোনো উল্লেখ ছিল না। তবে স্যার ইকবাল বাংলা ও আসাম নিয়ে মুসলমানদের জন্য অপর একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন বঙ্গাসাম। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মতপার্থক্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দাবীর সমর্থনে আন্দোলন তীব্র হয়।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এ সময় ঘোষণা করা হয় যে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতে শাসনতান্ত্রিক সমাধান সম্ভব নয়। মুসলমানগণ এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি ওয়াজির হাসান ঘোষণা করেন যে, উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সমাজ মাত্র নহে, নানাদিক হতে দুটি পৃথক জাতি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাতে মোহাম্মদ জিন্নাহ সাহেব ঘোষণা করেন যে, 'ভারতবর্ষে মুসলিম লীগ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়'। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, 'ক্ষুদ্র দায়িত্ব ও স্বল্প ক্ষমতা প্রয়োগের যে সীমিত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সুষ্ঠুভাবে এটাই প্রমাণ করেছে যে, হিন্দুস্থান হিন্দুদের জন্যে। কংগ্রেস সরকারের অধীনে মুসলমানগণ ন্যায়-নীতি বা

www.pathagar.com

সততার কোনটিই আশা করতে পারে না'। তিনি মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন যে, 'আমি চাই মুসলমানেরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং স্বহস্তে তারা তাদের ভাগ্য গড়ে তুলুক। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত কোনো সমঝোতা সম্ভব নয়'। তিনি ভারতের প্রাদেশিক পরিষদের মুসলিম সদস্যদের মুসলিম লীগে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক, পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী সিকান্দার হায়াত খান, এবং আসামের প্রধানমন্ত্রী স্যার মোহাম্মদ সাদউল্লাহ নিজেদের দলবলসহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে মুসলিম লীগ স্বীয় প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় এবং মুসলিম লীগের জয়যাত্রা শুরু হয়।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪০ সালে জানুয়ারী মাসে একটি ইংরেজী পত্রিকায় দ্বি-জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতে ২টি জাতি রয়েছে, এবং সাধারণ মাতৃভূমির শাসন ব্যবস্থায় উভয় জাতির অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে'। তাঁর দ্বি-জাতিতত্ত্ব আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই নীতির উপর ভিত্তি করে তিনি দ্বি–জাতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন 'হিন্দু–মুসলিম দু'টি পৃথক জাতি।'

এদিকে ১৯৪০ সালের ২২ ও ২৩ মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৭ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে ২৩ মার্চের অধিবেশনে মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে ফজলুল হক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগের কার্যবিবরণীতে এই প্রস্তাবটি 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। এ প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু মালিকাধীন পত্রিকাগুলি 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত বলে বড় বড় শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। লাহোর প্রস্তাবের ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয় ঃ

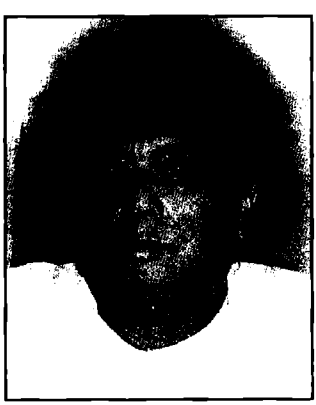

এ. কে ফজলুল হক

Resolved that it is the considered view of this Session of the All-India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principle, viz that geographically contiguous

www.pathagar.com

units are demarcated into regions which should be so constituated with such territorial re-adjustment as may be necessary that the areas in which the Muslims are numberically in a majority, as in the North-Western and Eastern zones of India, should be grouped to constitute "Independent States", in which the constituent units shall be autonomous and sovereign.

কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাই এদেশে কার্যকরী হবে না বা মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি উহা নিম্নে উল্লেখিত মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, যথা আবশ্যক মত আঞ্চলিক পুনর্বন্টন দ্বারা স্থানগুলি এভাবে গঠিত হবে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অঞ্চল একত্র করে স্বাধীন রাষ্টসমূহ গঠন করতে হবে। এবং রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত অংশগুলি হবে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।" লাহোর প্রস্তাবে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও আসাম নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

সভাপতির ভাষণে জিন্নাহ বলেন যে, "হিন্দু–মুসলমানদের ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতিনীতি ও সাহিত্য পৃথক ও স্বতন্ত্র। তারা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না অথবা একত্রে আহার্যও গ্রহণ করে না। মূলতঃ তাদের সভ্যতা স্বতন্ত্র ও ভিন্নমুখী। তাদের জীবন দর্শন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, হিন্দু-মুসলমানগণ ইতিহাসের স্বতন্ত্র উৎস হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে থাকে। তাদের মহাকাব্য ভিন্ন, তাদের বীরসেনানীগণ স্বতন্ত্র এবং যেকোন প্রসংগ ভিন্ন। প্রায়ই একজনের বীরসেনানী অন্যজনের শত্রু এবং তাদের বিজয় ও পরাজয় অনুরূপ পরস্পর বিরোধী।" তিনি বলেন যে, 'ভুলবশতঃ প্রায়ই বলা হয় যে, মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। কিন্তু আসলে তা নয়, যে কোনও সূত্রে তারা একটি জাতি। ভারতবর্ষ একটি জাতি বা দেশ নয়। বহুজাতীয় জনসমাজ নিয়ে এই উপমহাদেশ গঠিত। তন্মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি বৃহৎ জাতি।'

এবছর আগষ্ট মাসে (১৯৪০) বড়লাট লর্ড লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে ভারতবাসীর স্বার্থেই ইংরেজ কেবলমাত্র একটি দলের হস্তে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করবে না। পরবর্তীকালে ব্যাপক সফর, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অধিবেশন ও সম্মেলনে যোগদান এবং বিবৃতির মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান আন্দোলনকে জোরদার করে তুলেন। একতা, ঈমান ও শৃঙ্খলা এই তিন নীতির

www.pathagar.com

দিকে মুসলিম জনগণকে আহ্বান জানান।

জিন্নাহর প্রধান কৃতিত্ব এই যে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হতে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে মুসলিম জাতীয় চেতনার বিকাশ সহজসাধ্য করেছিলেন।

ক্যাবিনেট মিশন

ক্ষমতাসীন শ্রমিক দলীয় প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলী ১৯৪৬ সালের ১৫ মার্চ ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবাসীদের দাবী স্বীকার করে নিয়ে ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীই নির্ধারণ করবে এবং ক্ষমতা যাতে দ্রুত ও শৃঙ্খলার সাথে হস্তান্তর হয়, ব্রিটিশ সরকার শুধু তার প্রতিই লক্ষ্য রাখবে। সে ঘোষণায় তিনি আরো বলেন যে, ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে কোনো অবস্থায় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়গুলোর অগ্রগতি ব্যাহত করতে দেয়া হবে না। মুসলিম লীগ তাৎক্ষণিকভাবে এ মন্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা দাবী করে। প্রধানমন্ত্রী এটলীর ঘোষণার এক সপ্তাহ পরে (২২ মার্চ, ১৯৪৬) ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার তিনজন সদস্য– ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং নৌ-সচিব এডি আলেকজান্ডার ভারতে আসেন। এ তিনজনই ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী ছিলেন বলে এ প্রতিনিধি দলকে 'ক্যাবিনেট মিশন' বলা হয়। ভারতে পৌঁছে এটলীর ঘোষণার পূর্বোক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে ক্যাবিনেট মিশন বলেন যে, আঞ্চলিক যেসব এলাকায় মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হবেন। মুসলিম লীগ মহল এ ব্যাখ্যা সানন্দে গ্রহণ করে। মন্ত্রী মিশন ১৯৪৬-এর ৩ এপ্রিল থেকে শুরু করে দেড় মাসের অধিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন সমঝোতা না হওয়ায় বিভিন্ন দলের সাথে ১২ মে ক্যাবিনেট মিশনের শেষ বৈঠকও ভেঙ্গে যায়। ব্যর্থ আলোচনা শেষে মন্ত্রী মিশন ১৬ মে একতরফাভাবে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের কাঠামো সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারনা এবং সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করেন।

১। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী সরাসরি গ্রহণ বা অস্বীকার না করে মন্ত্রী মিশন ভারতবর্ষকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করার প্রস্তাব করে। সেই ৩টি গ্রুপকে নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ (ডাক ও তারসহ) বিষয়–অন্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্যগুলোর হাতে থাকবে।

www.pathagar.com

২। উপরোক্ত ৩টি বিষয় ছাড়া অন্যসব ব্যাপারে গ্রুপ হবে সকল ক্ষমতার অধিকারী। গ্রুপভুক্ত যেকোন অংগ প্রদেশ ইচ্ছা করলে গ্রুপ থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারবে।

৩। প্রাদেশিক বিধান সভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণ দ্বারা ভারত ইউনিয়নের সংবিধান পরিষদ বা গণপরিষদ গঠিত হবে।

৪। নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে।

৫। ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশগুলোকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্তির প্রস্তাব করা হয় ঃ ক গ্রুপে রাখা হয় মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও উড়িষ্যা। খ গ্রুপে রাখা হয় পাঞ্জাব, সিন্ধু,বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং গ গ্রুপে রাখা হয় বাংলা ও আসাম প্রদেশ।

এ প্রস্তাবটি ঘোষিত হওয়ার পর কংগ্রেস সময়ক্ষেপণ না করে তা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে এই ভেবে যে, ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান ভিত্তিতে দ্বিখন্ডিত হবে না এবং কেন্দ্রে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে। মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশন প্রস্তাবে পাকিস্তান দাবীর স্বীকৃতি থাকায় ৬ জুন এ প্রস্তাব গ্রহণ করে।

কিন্তু কংগ্রেস শীঘ্রই তাদের মত পরিবর্তন করতে থাকে। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস বাংলার সাথে 'গ' গ্রুপভুক্ত হওয়ার অসম্মতি জানালে কংগ্রেস মহলে মতবিরোধ দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধী আসাম কংগ্রেসকে বলিষ্ঠ সমর্থন দান করেন। কংগ্রেসের প্রথম সারির অধিকাংশ নেতা গ্রুপিং প্রস্তাবটির পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেস মহলে এই মত প্রবল হয়ে ওঠে যে, ভবিষ্যতে মুসলিম প্রধান 'খ' এবং 'গ' গ্রুপ কেন্দ্র থেকে আলাদা হয়ে দুটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। সে অবস্থায় 'গ' গ্রুপ ভুক্তির কারণে হিন্দু প্রধান আসাম তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। গান্ধী, বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং আরো কয়েকজন নেতার সমর্থনে আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গোপীনাথ বড়দলই ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করতে থাকেন। অপরদিকে, জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সহ অধিকাংশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু পন্ডিত নেহেরু শেষ পর্যন্ত তার মত পরিবর্তন করে কেন্দ্রের হাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য এবং মুদ্রা ও শুল্ক ব্যবস্থা অর্পণের দাবি উত্থাপন করেন। মুসলিম লীগ জোরের সাথে বলে যে, নেহেরুর দাবী অযৌক্তিক এবং তা কার্যত মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব বিরোধী। মিশন লীগের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রস্তাবিত গ্রুপ

www.pathagar.com

ব্যবস্থা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তখন মুসলিম লীগ যুক্তিসংগতভাবে মন্ত্রী মিশনের গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে। কংগ্রেস সে পরিকল্পনাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবই শুধু গ্রহণ করে এবং বাকি সব গ্রহণে অসম্মতি জানায়। স্পষ্টতই ক্যাবিনেট মিশনের গোটা পরিকল্পনাই বাতিল হয়ে যায়। কারণ সে পরিকল্পনা প্রস্তাবে শর্ত ছিল যে, আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন করা যাবে না। এমতাবস্থায়, ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে প্রাদেশিক আইন পরিষদ সমূহের পরোক্ষ ভোটে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ২১১ ও মুসলিম লীগ ৭৩টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনের পর বড়লাট লর্ড ওয়াভেল মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুসারে কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মিশনের প্রস্তাব ছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মন্ত্রীসভায় কংগ্রেস পাঁচ, মুসলিম লীগ পাঁচ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দুই আসন পাবে। কংগ্রেস এ বণ্টন ব্যবস্থা মেনে নিতে দৃঢ় অসম্মতি জানালে বড়লাট কংগ্রেসের আসন সংখ্যা করেন ছয়, লীগের পাঁচ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি আসন নির্ধারণ করেন।

পাকিস্তান প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের ৬ বছর পরে ৯ এপ্রিল, ১৯৪৬ হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আইন সভার মুসলিম সদস্যদের দিল্লী অধিবেশনে একটি মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমর্থন করেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান, মালিক ফিরোজ খান নুন, শওকত হায়াত খান, বেগম শাহনাওয়াজ খান প্রমুখ। এই প্রস্তাবে বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

দিল্লী প্রস্তাবটি নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

Resolution of the Muslim League at New Delhi April 9. 1946

1. That the zones comprising Bengal and Assam in the North-East and the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Beluchistan in the North-West of India namely Pakistan zones where the Muslims are in dominant majority, be constituted into a sovereign independent state that an unequivocal undertaking be given to implement establishment of Pakistan without delay.

www.pathagar.com

2. That two separate Constitution making bodies be set up by the people of Pakistan and Hindustan for the purpose of framing their respective constitution.
3. That the minorities in Pakistan and Hindustan be provided with safe-guards on the lines of the All India Muslim League resolution passed on 23rd March, 1940 at Lahore.
4. That the acceptance of the Muslim league demand of Pakistan and its implementations without delay are the sine-qua-non for Muslim League co-operation and participation in the formation of an interim Government at the Centre.

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাসিম এই প্রস্তাবকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে বিবেচনা করেন। পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করায় হিন্দু রাজনীতিবিদগণ অসন্তোষ্ট হন।

১৯৪৬ সালের ১৭ জুলাই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বোম্বাই অধিবেশনে ১৬ আগষ্ট পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Re-action Day) পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই কর্মপন্থার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মুসলিম লীগ সদস্যগণকে ব্রিটিশের খেতাব বর্জনের অনুরোধ করা হয়। বাংলার মুসলিম লীগ নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন তৎক্ষণাৎ মঞ্চে উঠে স্যার খেতাব বর্জন করেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন, নওয়াব ইসমাইল ও চৌধুরী খালেকুজ্জামান সমবায়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অব এ্যাকশন বা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। খাজা নাজিমুদ্দিন কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মন্তব্য করেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। মুসলিম লীগের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনের অপব্যাখ্যা সাম্প্রদায়িক হিন্দুদেরকে দাঙ্গার প্রস্তুতি নিতে ইন্দন যোগায়, সাধারণ শান্তিপ্রিয় হিন্দুদেরকে বিভ্রান্ত করে। অথচ ২ আগস্ট (১৯৪৬) বোম্বে নগরীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা হলো ঃ Calls upon the Muslims of India to suspend all business on August 16, 1946 & observe complete hartal অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদেরকে ১৬ আগস্ট সকল কাজকর্ম বন্ধ রেখে পূর্ণ হরতাল পালন করার আহ্বান জানায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কে অপব্যাখ্যার অপরাধে স্যার খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

সাংগঠনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' হিন্দুদের বিরুদ্ধে বলে প্রচার করে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকে। কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হিন্দু ধনিক-বণিক ও জমিদার-জোতদারদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, কলকাতাসহ বাংলা পাকিস্তানভুক্ত হলে তাদের আর সেখানে ধনে দাপটে বসবাস করা যাবে না। এ কারণে তারা ঐদিন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধানোর কাজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অতি গোপনে তার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ক্ষমতাসীন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগের কোয়ালিশন সরকারকে হেয় ও খুনী হিসেবে চিহ্নিত করতে এবং কলকাতা যাতে কোন অবস্থায় পাকিস্তানভুক্ত না হয় সে উদ্দেশ্যে ভারতের কয়েকজন হিন্দু শিল্পপতি কলকাতায় বসে মহাদাঙ্গা ঘটানোর সকল কলকাঠি চালনা করে। দেশ ভাগের পর বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, কলকাতা শহরসহ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু প্রধান ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত করাই ছিল ঐ দাঙ্গার মুখ্য উদ্দেশ্য।

১৬ আগস্ট দাঙ্গা বাধানোর যে ষড়যন্ত্র চলছিল সে সম্পর্কে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পুলিশ বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগসহ কেউ সোহরাওয়ার্দী সরকারকে ঘুর্ণাক্ষরেও অবগত করে নি। পক্ষান্তরে, দাঙ্গা পরিকল্পনাকারীগণ ও কলকাতার অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ বিহার ও যুক্ত প্রদেশ থেকে কয়েক হাজার ভাড়াটিয়া গুন্ডা আমদানী করে স্থানীয় হিন্দুদের সাথে দলভুক্ত করে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় অস্ত্রশস্ত্রসহ দাঙ্গাকারীদের প্রেরণ করে। নগরীর প্রধান অস্ত্রব্যবসায়ীরা ছিলেন হিন্দু। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলি সংগ্রহ করে অবাধে দাঙ্গাকারীদের হাতে তুলে দেয়। এছাড়া, কামারশালাসমূহে অগণিত রামদা, কিরিচ, ছোরা, বর্শা ইত্যাদি তৈরি করে হিন্দুদের হাতে দেয়া হয়। বহু চিহ্নিত এলাকায় সাধারণ হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি ককটেল, এসিড, তেল ইত্যাদি মওজুদের ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি, পুলিশ বাহিনীর প্রায় সকল হিন্দু-সদস্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গাকারীদের সাথে যোগদান করে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালে কলকাতায় মোট অধিবাসীদের শতকরা ২৩.৪ ভাগ মাত্র ছিল মুসলমান এবং নিম্নপদস্থ পুলিশের চাকুরিতে মুসলমানের হার ছিল শতকরা ১৩ ভাগ। উচ্চপদসমূহের শতকরা ৯৬ ভাগ ছিল অমুসলমানদের হাতে। দাঙ্গার পূর্ব মুহূর্তকালে কলকাতার মুসলমানগণ যখন ছিল এক চরম অসতর্ক অবস্থায়, তখন সোহরাওয়ার্দী সরকার জনসভা ও মিছিলের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে 'প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

সংগ্রাম দিবস' পালনের উদ্দেশ্যে ১৬ আগস্ট সরকারী ছুটি ঘোষণা করে। এ ছুটির সুযোগে অসংখ্য চাকুরিজীবী হিন্দু যুবক ও হিন্দু শ্রমিক-কর্মচারীগণ পূর্ব পরিকল্পিত দাঙ্গায় যোগদান করে। কলকাতার মানিকতলা থেকে ভোরবেলা বাজারের দোকানপাট বন্ধ করে সর্বত্র হিন্দুগণ দাঙ্গা শুরু করে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নগরীর শোভাবাজার, শ্যামবাজার, বাগবাজার, ভবানীপুর, কালীঘাট ও টালিঘাটসহ বহু এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গাকারী হিন্দুগণ দুপুরের মধ্যেই এলাকাসমূহের মুসলমানদের হত্যা করে এবং তাদের বাড়িঘর নিশ্চিহ্ন করে দেয়। সেদিন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক আয়োজিত কলকাতা গড়েরমাঠের জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার মুসলমানের মিছিলের ওপর সশস্ত্র হিন্দুগণ আক্রমণ করে এবং রাস্তার দু'দিকের হিন্দুবাড়ি থেকে গরম তেল, এসিড, জ্বলন্ত কয়লা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতা নগরীর বহু এলাকা চলে যায় হিন্দু দাঙ্গাকারী ও তাদের সাথে দাঙ্গায় যোগদানকারী হিন্দু পুলিশের দখলে। নগরীর প্রায় সবক'টি থানার অফিসার ইন-চার্জ ছিলেন হিন্দু। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের প্রধানও ছিলেন হিন্দু-ঘেঁষা অমুসলমান। অমুসলমানদের একতরফা হত্যা দ্রুত সমগ্র কলকাতা ও শহরতলীতে ছড়িয়ে পড়েছে দেখে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দাঙ্গা দমনে দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যান। লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টার ও বিভিন্ন থানার কর্তৃত্ব বদল করে দেন। প্রায় ছত্রিশ ঘন্টা অবিরাম পরিশ্রমের ফলে দাঙ্গা পরিস্থিতি কতকটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসে। দাঙ্গা চলে তিনদিন। প্রাণ হারায় ১৫/২০ হাজার লোক। আহত হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। দাঙ্গার চতুর্থ দিনে হতাহতের সংখ্যা অনেক কমে আসলেও প্রায় মাসখানিক চলে চোরাগোপ্তা হামলা। হত্যাযজ্ঞ যাতে পুনরায় না ঘটে সে জন্য প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সেনাবাহিনী থেকে ছাঁটাইকৃত শতাধিক সৈন্যকে পাঞ্জাব থেকে নিয়ে এসে কলকাতার পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ দান করেন। দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার থানাগুলো এবং লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দায়িত্ব মুসলমান কর্মকর্তাদের হাতে অর্পণ করেন। কলকাতার মহাদাঙ্গায় চার লক্ষাধিক মুসলমান এবং বহু হিন্দু নর–নারীর প্রাণ ও ধন-সম্পত্তি রক্ষায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রশংসনীয় সাহস ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। পরবর্তীতে ভারত সরকার কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্তের জন্য পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ফজলে আলীর নেতৃত্বে যে কমিশন গঠন করে তার কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই ভারতবর্ষ বিভক্তকরণ পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় কমিশনের কোন রিপোর্ট

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়নি। বেসরকারি হিসাবে হতাহতের সংখ্যা ৫০ হাজার। মেনন ও লাম্বি লিখেছেন ১৫,০০০ ও ১৪,০০০ হতাহত। আয়ান স্টিফেনসনের হিসাবে হতাহত ২০,০০০-এরও বেশি। কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে 'ভারতের বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়' গ্রন্থে বলা হয় ঃ ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মহানগরী কলকাতার বুক জুড়ে শুরু হয় এক ভয়াবহ দাঙ্গা। একটানা তিন দিন ধরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। হিন্দু-মুসলমানের তাজা খুনে রঞ্জিত হয় মহানগরীর রাজপথ। গুলিবিদ্ধ, ছুরিকাহত এবং অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে ছ'হাজার মানব-সন্তান। এ ছাড়া বহু নারী পাশবিক অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয় এবং অনেককে বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়। এদের সংখ্যা ২০ হাজারের কম হবে না।' যা হোক, সেদিন কলকাতায় হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে পাকিস্তানের প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

কলকাতার দাঙ্গা শেষ হয়ে আসলেও তার প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন স্থানে। এই দাঙ্গার পর সেপ্টেম্বরে নোয়াখালীতে স্বল্পকালীন দাঙ্গা বাধে। তবে জীবনহানি একশতও হয়নি। পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর সেনাপতি টুকার লিখেছেন ঃ

The number of casualties will be from two hundred to three hundred but Terrible and delibarately false stories were blown all over the world by hysterical Hindu press. (While Memory serves : Francis Tucker, Page 176)

কিন্তু নোয়াখালীর এ দাঙ্গার সংবাদ কলকাতার হিন্দু সমর্থক দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এমনভাবে প্রচার করা হয় যে, সে যেন কলকাতার হত্যাযজ্ঞের চেয়ে অনেক বেশি। এ প্রচারণা ছিল একটি পরিকল্পনাধীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক। তাই, কলকাতায় দাঙ্গাকালে উপস্থিত না থাকলেও ১৯৪৬ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত নোয়াখালী দাঙ্গাপীড়িত অঞ্চলে গান্ধী অবস্থান করেন। গান্ধীজীর জীবনে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে এসে তিনি কোথাও এত দীর্ঘকাল থাকেননি। গান্ধীজীর নোয়াখালী থাকাকালীন সময়ে দেশ-বিদেশের বহু সাংবাদিক ও রাজনৈতিক পর্যটক গান্ধীজীর সংগে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান

মহাত্মা গান্ধী

www.pathagar.com

নেতা জওহরলাল নেহেরু, রাজা গোপালচারী, যুক্তবাংলার শেষ মুসলিম প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নোয়াখালীতে এসে গান্ধীজীর সংগে দেখা সাক্ষাৎ করে যেতেন। গান্ধীজী তার শান্তি মিশনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারেও নেতাদের সংগে বৈঠক করতেন। প্রার্থনা সভা ব্যতীত গান্ধীজীর সংগে সর্বসাধারণের সাক্ষাৎকার সম্ভব ছিল না।

গান্ধীজীর নোয়াখালী অবস্থানের সুযোগে হিন্দুরা মুসলমানদের নানাভাবে পুলিশী হয়রানির শিকারে পরিণত করে। তাই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ২ ডিসেম্বর ১৯৪৬ মহাত্মা গান্ধীকে নিম্নলিখিত চিঠিটি প্রেরণ করেন ঃ

'I appreciate very much your desire to bring about peace between the Hindus & Muslims of Bengal but Muslims feel that if you really wish to pursue your objective to establish good fellowship. Behar should be the real field. Your stay has encouraged many of your followers to manufacture evidence and to place it before you to carry on the persecution of the local Muslims, the local Muslim league leaders, which will not possibly lead to mutual confidence in the near future.'

অর্থাৎ ঃ 'বাংলার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনার ইচ্ছাকে আমি অতীব মূল্যবান মনে করি। তবে, মুসলমানেরা মনে করে যে, আপনি যদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার নীতি বাস্তবিকই চালিয়ে যেতে চান, তাহলে বিহারই প্রকৃত ক্ষেত্র হওয়া উচিৎ। আপনার অবস্থান আপনার অনুগামীদের অনেককেই বানোয়াট প্রমাণাদি উদ্ভাবন করতে এবং স্থানীয় মুসলমান ও স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে আপনার সমীপে তা পেশ করতে উৎসাহিত করেছে, যা অদূর ভবিষ্যতে পারস্পরিক আস্থা স্থাপনে সম্ভবতঃ সহায়ক হবে না।'

নোয়াখালীর দাঙ্গা দৈনিক পত্রিকাসমূহে বিরাট ভাবে প্রচারের কয়েক সপ্তাহ পর পরিকল্পিত ভাবে বিহারে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বাধানো হয়। বলা বাহুল্য নোয়াখালীতে গান্ধীর উপস্থিতির ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার নগ্ন প্রকাশ ঘটে বিহারের দাঙ্গায়। বিহার প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল শতকরা ১৪ জন। এদের হত্যার জন্য কিছুদিন থেকে প্রস্তুতি চলছিল। বিহার মন্ত্রীসভার কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা দাঙ্গায় উস্কানি দেন এবং নিজেরাই মুসলিম হত্যাকান্ড সক্রিয় অংশ গ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। প্রদেশের ৩টি জেলায় পরিকল্পিত একইদিন এবং প্রায় একইসময় মুসলমানদের আক্রমণ করা হয়। কোনো কোনো মুসলমান এলাকা আক্রমণের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দু দাঙ্গাকারীগণ অতি অল্পসময়ের মধ্যে সমবেত হয়ে হত্যাযজ্ঞ ঘটায়। বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার চাপে দাঙ্গাউপদ্রুত এলাকায় প্রেরিত সেনাবাহিনী হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথম ৩ দিনের দাঙ্গায় ২৫/৩০ হাজার মুসলমানকে হত্যা করা হয়। এমন বহু গ্রাম আছে যেখানে দাঙ্গার পর একজন মুসলমানও জীবিত ছিলনা। উল্লেখ্য যে, ভারতের কোন খ্যাতনামা কংগ্রেসী নেতার মুখে বিহারের পৈশাচিক দাঙ্গার বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারিত হয়নি। বিহারের পর মধ্য প্রদেশের কোনো কোনো এলাকায় দাঙ্গা হাঙ্গামায় মুসলমানদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পর কংগ্রেস নেতা খান আব্দুল গাফফার খান প্রায় একমাস বিহারের দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চলে অবস্থান করেন। সীমান্ত গান্ধীর এ উপস্থিতির ফলে মুসলমানদের বাস্তভিটা ত্যাগ অনেক কমে যায় এবং অনেকে আবার পরিত্যাক্ত বাস্তভিটায় ফিরে আসে। এসব হত্যাকান্ডের ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি গণ-সচেতনতার সৃষ্টি হয়। যারা কংগ্রেসের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল সেই সব মুসলমানও বুঝতে পারলো মুসলমান হিসেবে বাঁচতে হলে পৃথক আবাসভূমির একান্ত প্রয়োজন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর নির্দেশ ক্রমে ২৪ আগষ্ট গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল কলকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য সেখানে যান। মেনন লিখেছেন, সেখানে সব দেখে শুনে ভাইসরয়ের বিশ্বাস হয়েছিল যে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা করতে না পারলে কলকাতার পনুরাবৃত্তি হবে সারা ভারতে।"

অন্তর্বর্তী সরকার (Interim Government)

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নে হিন্দুদের প্রতি বৃটিশ সরকারের পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছিল বেশ আগেই। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল তার পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এরপর মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই বৃটিশ সরকার কংগ্রেস সভাপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সুযোগ করে দেন [২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬] এতে স্বভাবতই মুসলিম লীগ ক্ষুব্ধ হয়। ২ সেপ্টেম্বর কালো পতাকা উত্তোলন ও কালোদিবস পালনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ভারতের সর্বত্র বৃটিশ কংগ্রেস আঁতাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই, আহমদাবাদে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামায় কয়েক হাজার মুসলমান প্রাণ হারায়। বড় লাট বুঝতে পারলেন, মুসলিম লীগ যেভাবে পূর্বের তুলনায় অনেকবেশি সংগ্রাম মুখর হয়ে উঠেছে তাতে

www.pathagar.com

লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের বাইরে রেখে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি নতুন করে লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। লীগ সরকার ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চালিয়ে যাবার লক্ষ্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১২ ও ১৩ অক্টোবর কায়েদে আজম ওয়াভেল বৈঠকে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। এবং ১৩ অক্টোবর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। তদানুযায়ী ২০ নভেম্বর (১৯৪৬) লিয়াকত আলী খান (অর্থ), আই আই চুন্দ্রীগড় (বাণিজ্য), সরদার আবদুর রব নিশতার (যোগাযোগ), রাজা গজনফর আলী খান (স্বাস্থ্য), যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (আইন), অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দেন। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল পরিচালিত সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের মুসলিম লীগের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ সহানুভূতি ছিল। তাই মুসলিম লীগ শ্রীমন্ডলকে কেন্দ্রীয় সরকারের সদস্য হিসেবে মনোনীত করে।

কংগ্রেস প্রথমে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও দিতে অস্বীকার করলেও পরে অর্থ দফতর দিতে রাজী হয়। কংগ্রেসের ধারণা ছিল লীগ নেতাদের মধ্যে কেউ অর্থনীতি বিষয়ে পারদর্শী নয় বলে এ পদে তারা চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে। এ সময় বিশিষ্ট মুসলিম অর্থনীতিবিদ চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কায়েদে আজমকে অর্থ দফতরের দায়িত্ব লীগের হাতে নেয়ার পরামর্শ দিয়ে সর্বপ্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দেন। মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিল। লিয়াকত আলী খান স্বয়ং অর্থ দফতরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর সহায়তায় গণপরিষদে এমন এক সুন্দর বাজেট পেশ করেন যা সর্বত্র 'পুওর ম্যানস বাজেট' (গরীবের বাজেট) বলে প্রশংসিত হয়। অর্থ দফতরের অনুমোদন সরকার পরিচালনায় সর্বত্র অপরিহার্য এটা স্মরণে রেখে অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সুপরিকল্পিত অসহযোগিতার মাধ্যমে কংগ্রেস মন্ত্রীদের নিজ দফতর চালানো অসম্ভব করে তুললেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে লীগ কংগ্রেস দ্বন্দজনিত এই অচলাবস্থা এবং হিন্দু প্রধান প্রদেশ সমূহে মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা বিস্তারের পাশাপাশি পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে লীগের নেতৃত্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাব দৃষ্টে বৃটিশ সরকার সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. এটলী ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন ১৯৪৮ সালের জুনের আগেই ব্রিটিশ সরকার দায়িত্বশীল ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন শেষ

www.pathagar.com

বড়লাটের কার্যভার গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন কন্যা পামেলার দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় কৃষ্ণমেনন ১৯৪৬ সালে ভাইসরয় রূপে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে পাঠানোর জন্য বৃটেনের সরকারি মহলে তদ্বির করেছিলেন। কংগ্রেস তাকে গ্রহণ করবে তাও জানিয়েছিলেন। কৃষ্ণ মেনন লন্ডনে বাস করতেন। তিনি সেখানে জওহরলালের প্রতিনিধিত্ব করতেন ও সোস্যালিষ্ট মহলে ঘোরাঘুরি করতেন। লেবার পার্টির প্রভাবশালী সদস্য হ্যারল্ড লাস্কির বিশেষ প্রিয় ছিলেন তিনি। মেনন যে জওহরলালের হয়ে এ অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সংগে আলাপ আলোচনা করেন। এ সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের পাকিস্তান দাবীর প্রতি অটল মনোভাব প্রদর্শন করলে কংগ্রেস এ দাবী মেনে নেয়। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন, মাউন্টব্যাটেন আসার কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পান যে প্যাটেল ও নেহেরু ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি কিছুটা ঝুঁকে পড়েছেন। তিনি লিখেছেন, ৩১ মার্চ, ১৯৪৭ গান্ধীজী দেখা করেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে। সেই মিটিং থেকে ফেরার কিছু পরেই সর্দার প্যাটেল দেখা করেন গান্ধীজীর সঙ্গে। প্যাটেল ও গান্ধীজীর মধ্যে প্রায় দুই ঘন্টা কথাবার্তা হয়। আজাদ লিখেছেন, '২ এপ্রিল ১৯৪৭ তারিখে গান্ধীজী আবার মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা আমি জানিনা। তবে আমি যখন গান্ধীজীকে আবার দেখলাম তখন আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পেয়েছিলাম। কারণ আমি তখন দেখলাম যে তারও (অর্থাৎ গান্ধীজীরও) পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য তখনও তিনি খোলাখুলিভাবে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন না। আমি আরো আশ্চর্য হলাম যখন গান্ধীজী তার কথায় সর্দার প্যাটেলের যুক্তিরই পুনরাবৃত্তি করলেন। প্রায় দুই ঘন্টার ওপর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু তাতে তার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না।' [India Wins Freedom by Abul Kalam Azad] যাহোক ২রা এপ্রিল কংগ্রেস ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় সম্মতি দেন।

কিন্তু মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য কংগ্রেস এক নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করে যে বাংলা ও পাঞ্জাব হিন্দু ও মুসলিম অধিবাসী এলাকা হিসেবে ভাগ করতে হবে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার জেনকিনস্, বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ এ প্রস্তাবের

www.pathagar.com

বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৮ এপ্রিল ভারতের গণপরিষদে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করেন–'ভারতের যতটা অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের ভেতর স্বেচ্ছায় থাকতে চায় ততটার জন্য গঠনতন্ত্র রচনা করেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।' রাজেন্দ্র প্রসাদের এই ঘোষণায় মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী সমর্থিত হলো। জিন্নাহ ১ মে ঘোষণা করলেন–"সমগ্র বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু প্রদেশকে পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের মধ্যে চাই।' হিন্দুস্থান-পাকিস্তান এই টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে হিন্দুমহাসভা বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করার জন্যে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুললেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভাগকে অস্বীকার করলেন। কিন্তু কিছুতেই তারা বড়লাটকে টলাতে পারলেন না। সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলা আন্দোলন জোরদার করে তুললেন।

www.pathagar.com

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা আন্দোলন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী

লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ১৯৪৬ সালের মার্চের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচনের অব্যবহিত পরই বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়। লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সে অনুসারে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সহ মুসলিম রাজনীতিবিদগণ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার কথা চিন্তা করতে থাকেন।

১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট 'শহীদ' ছদ্মনামে কলকাতার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তার একটা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন, 'কোনো মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রক্তপাত এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে বৈকি। মুসলমানদের কাছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোনো কিছু এত প্রিয় কিংবা মহৎ নয়।'

১৯৪৬ সালের এপ্রিলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদের স্থলে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১০ জুলাই তিনি ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে এবং তারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব পরিবর্তন করতে পারবে। তার ঘোষণায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নেহেরুর ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ২৮ জুলাই বোম্বেতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা দেন। ৮ আগস্ট নেহেরু মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে সোহরাওয়ার্দী ১০ আগস্ট দিল্লীর এক জনসভায় ঘোষণা করেন ঃ "যদি কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তিনি বাংলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করবেন এবং বাংলাকে স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে গণ্য করা হবে। এ প্রদেশ থেকে কোন রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে না অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ বাংলা সরকার মানবে না"।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লীগ কর্তৃক পাকিস্তান দাবীর সমর্থনে "প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

সংগ্রাম দিবস" উদ্‌যাপনের দিন জনাব সোহরাওয়ার্দী বাংলা প্রদেশে সরকারী ছুটি ঘোষণা করেন।

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলমানগণ প্রশাসন যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক, খাজা নাজিমুদ্দিন ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভায় হিন্দু মন্ত্রী থাকলেও তাঁরা কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কংগ্রেস কোনো সময়ই কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে রাজি হয় নি। সুতরাং প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার জন্য দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে এবং নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। এ পরিস্থিতিতে হিন্দু সম্প্রদায় বঙ্গ ভঙ্গ দাবি এবং পশ্চিম বাংলাকে ভারতের অধীন একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের আন্দোলন আরম্ভ করে।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আজাদ হিন্দু ফৌজের জেনারেল এ.সি চ্যাটার্জি বাংলাকে ভাগ করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন। এই ফৌজের অন্যান্য জেনারেলগণ এ.সি চ্যাটার্জির এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কিন্তু কংগ্রেস-এর বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা না করায় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও বাংলা ভাগ করার আকাঙ্ক্ষা দানা বাধে।

অপরদিকে ২২ ফেব্রুয়ারি হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের সাথে সাক্ষাৎ করে পরের দিনের পত্রপত্রিকায় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবী তোলেন। কেননা, বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মিলিতভাবে বঙ্গভঙ্গের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। সর্দার প্যাটেল ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ কান্তিদ্বারকা দাসকে যে চিঠি লেখেন সেই চিঠিতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান ও অখন্ড বাংলার দাবী সম্পর্কে সর্দার প্যাটেলের মনোভাবের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ চিঠিতে সর্দার প্যাটেল লেখেন, মুসলিম লীগ যদি পাকিস্তান পাওয়ার জন্য জেদাজেদি করে তাহলে তার একমাত্র বিকল্প (Alternative) হলো বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি– তারা কখনও পুরো পাঞ্জাব ও পুরো বাংলা পেতে পারে না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

www.pathagar.com

আলোকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা দাবি করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করেন।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল হুগলী জেলার তারকেশ্বরে হিন্দু মেলায় মহাসভার অন্যতম নেতা জেনারেল এ.সি চ্যাটার্জি ঘোষণা করেন 'বঙ্গভঙ্গ বিভাগের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের একটি মাতৃভূমি চাই।'

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনলেন–২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণা অনুসারে ব্রিটিশ সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, তাহলে বাংলার যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সংগে থাকতে ইচ্ছুক তাকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। বাংলার গঠনতন্ত্র রচনায় যদি সার্বজনীন ভোটের অধিকার, সংযুক্ত নির্বাচন আর সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হয় তাহলে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দুটো প্রদেশ গঠন করতে হবে। বাংলার যে অংশ এই নীতি অনুসারে গঠনতন্ত্র রচনা করতে ইচ্ছুক তাকে সে অধিকার দিতে হবে।

৫ এপ্রিল ১৯৪৭ তারকেশ্বরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার যে সম্মেলন হয় তাতে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত করে হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য ড. মুখার্জী একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠনের ভার গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে ভি, আর, সাভারকরের বাণী বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ ঃ To frustrate the vivisection of Akhand Hindustan, the Hindus must first vivisect Pakistan. The first immediate step was the creation of a Hindu Province in West Bengal, the second the expulsion of Muslim trespassers from Assam at any cost so as to sandwich and smother East Pakistan between two Hindu Provinces, the third creation of a Hindu-Sikh Provivce of East Punjab.

এরপর থেকে বঙ্গভঙ্গ একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠলো। যে হিন্দু নেতৃবৃন্দ একদা বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ হবে এই যুক্তিতে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) রদের জন্য দেশময় তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তারাই সময়ের ব্যবধানে সেই বাংলাকে বিভক্ত করার জন্য নতুন আন্দোলন শুরু করেন। হিন্দু মহাসভার নেতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। কারণ পশ্চিমবাংলার কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলে তখন সমগ্র ভারতের অবাঙালি হিন্দু পুঁজিপতিদের বিরাট অংকের পুঁজি নিয়োজিত ছিল। তাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে বলে বিভক্ত বাংলার পশ্চিমাংশ যাতে ভারতের সংগে

www.pathagar.com

যুক্ত হয় তার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগলেন। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী এমনও ঘোষণা করেন ভারত ভাগ না হলেও বাংলা ভাগ করতে হবে।

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ তারিখে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে পূর্বাঞ্চলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি নামে একটি সংগঠন ১৯৪৪ সালে আসাম-বাংলা প্রদেশ নিয়ে ইস্টার্ন পাকিস্তান দাবি করে। পাকিস্তান দাবির সমর্থক করাচির 'দি ডেইলি ডন' পত্রিকা ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারিখের সংখ্যায় বাংলা-আসামকে অখণ্ড পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে মানচিত্র প্রকাশ করে। মূলত ১৯৪০ সাল থেকে আসাম-বাংলা নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলে। মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি করলেও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রথমে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করে। মুসলিম লীগের নেতা মওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা দাবি করেন। তাঁরা অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন।

হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতাদের বঙ্গভঙ্গের দাবির প্রেক্ষিতে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার দাবি উত্থাপন করেন।

সোহরাওয়ার্দী বঙ্গভঙ্গ দাবীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন– "I speak for Bengal, I am visualising an independent undivided sovereign Bengal in divided India." তিনি আরো বলেন– আমি বরাবরই যুক্ত বাংলা ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে। আমি যথাসময়ে বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে একটি বিবৃতি দেব এবং তাতে প্রমাণ করব যে বঙ্গ বিভাগ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-তফসিলি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য আত্মহত্যারই শামিল হবে। আমি জানি যে, যারা এ জিগির তুলেছেন তারা মতলবি প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত। তারা আন্দোলন গড়ে তুলতে, সে আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার করতে, এমন কি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন হিন্দুদের বিভ্রান্ত করে সে আন্দোলনে তাদের সমর্থন আদায় করতেও কোনো কসুর করবেন না। তবে আমি এখনো আশা করি একদিন-না-একদিন শুভবুদ্ধির জয় হবেই, তাই আমি আশা করব, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা করার আগে তাঁরা অবশ্যই একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হবার চেষ্টা করবেন এবং সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাকে একটি মহান দেশ এবং বাঙালিদের একটি মহান জাতিতে পরিণত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে লর্ড ওয়াভেল-এর স্থলে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেছেন (২২ মার্চ, ১৯৪৭)। লর্ড মাউন্টব্যাটেন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিশ্চিত হন যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এবং ভারত বিভাগ ছাড়া হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের আর কোন পথ নেই। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে নেহরু ও প্যাটেল অবশেষে ভারত বিভাগ প্রস্তাবে রাজী হন (২ এপ্রিল, ১৯৪৭)। কিন্তু মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানকে জব্দ করার জন্য কংগ্রেস এক নতুন দাবী উত্থাপন করে যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে হিন্দু-মুসলিম অধিবাসী এলাকা হিসেবে ভাগ করতে হবে।

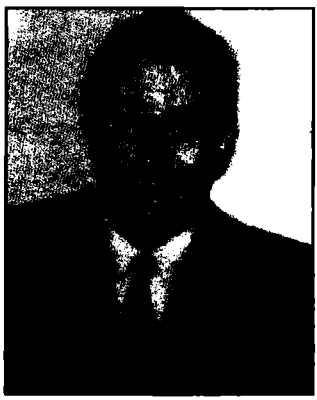

লর্ড মাউন্টব্যাটেন

মুসলিম লীগের অন্যতম নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন ও বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য দেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন ২৩ এপ্রিল যে বিবৃতি প্রদান করেন তা ১৯৪৭ সালের ২৪ এপ্রিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে বাংলার জনসাধারণ হিন্দু অথবা মুসলমান সকলের পক্ষেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ একান্ত প্রয়োজনীয় এবং আমি এ কথাও নিশ্চয়তার সহিত বলিতে চাই যে, বঙ্গবিভাগ বাঙালির স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক।" কেন্দ্রীয় পরিষদ লীগের ডেপুটি লীডার ও লীগ হাই কমাণ্ডের অন্যতম সদস্য খাজা নাজিমুদ্দীন মঙ্গলবার কলিকাতায় স্টেটম্যানের প্রতিনিধির নিকট উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন।

খাজা নাজিমুদ্দিন

খাজা নাজিমুদ্দীন আরো বলেন যে আমি বরাবর এই ধারণাই পোষণ করিয়াছি যে, বাংলার জনসাধারণ নিজেরাই যদি নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করিতে পারে তাহা হইলে বাংলার অগ্রগতি ও উন্নতির অপরিসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাংলাদেশ চিরকালই কেন্দ্রীয় সরকার ও অন্যান্য প্রদেশের নিকট হইতে বৈমাতৃক ব্যবহার পাইয়াছে। যখনই আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের সহিত কথাবার্তা বলি

www.pathagar.com

তখনই দেখিয়াছি তাহারা সকলেই একই দাবি করিয়া থাকেন যে বাংলাদেশকে তাহারা নিজস্ব শাসনকার্য পরিচালনা করিতে দেওয়া হউক। খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন তাহার বিবৃতির প্রসঙ্গে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মিঃ জিন্নাহ ও মিঃ গান্ধীর যুক্ত আবেদন সমর্থন করেন।

[দৈনিক আজাদ, এপ্রিল ২৪, ১৯৪৭]।

'১১ এপ্রিল ১৯৪৭, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের বাংলার ১১ জন হিন্দু প্রতিনিধি ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নিকট পেশকৃত এক স্মারকলিপিতে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভূখন্ডের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জন্য একটি স্বতন্ত্র স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশ গঠনের দাবী করেন।' [ইতিহাস কথা কয় ঃ পৃঃ ১৭]

'১৫ এপ্রিল ১৯৪৭, বাংলার ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টির নেত্রী শ্রীমতি লীলা রায় তাঁর ঢাকা জেলা সফর ও জনসভায় বক্তৃতার সময় এক বিবৃতিতে বলেন, বঙ্গবিভাগ দাবীর সমর্থকদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়।'

একইদিন ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রী কামাখ বাংলা বিভাগ দাবীর বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, 'এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে, যে বাংলা ৪০ বছর আগে বিভাগের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে বাংলায় আজ আবার বিভাগের দাবিতে মুখর হয়ে উঠেছে।'

মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি করলেও বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রথমে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন করে। মুসলিম লীগের নেতা মওলানা আকরম খাঁ ও খাজা নাজিমুদ্দিন বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা দাবী করেন। তাঁরা অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে ছিলেন।

১৯ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে মওলানা আকরম খাঁ বলেন, "মুসলিম বাংলা অবশ্যই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। বঙ্গভঙ্গ হতে পারে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানদের মুক্ত দেহের উপর। লাহোর প্রস্তাবে যে খসড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন প্রস্তাবই আমি সমর্থন করবো না।"

এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী বিশ্বাস করতেন বাংলা বিভক্ত হলেও দাঙ্গা আরো বৃদ্ধি পাবে। তিনি ১৯৪৬ সাল থেকেই অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখছিলেন। বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ তাঁর সাথে একমত ছিলেন এবং বাংলাকে বিভক্ত না করার জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বার বার অনুরোধ জানান। বাংলা বিভক্ত হলে পুর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ কি হবে, সে সম্পর্কে গভর্নর বারোজ বলেছেন, "এটা এত নিশ্চল এবং দরিদ্র হবে যে শেষে এটা পরিণত হবে একটি পল্লীবস্তিতে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ সকল কয়লার খনি, খনিজদ্রব্য, কলকারখানা, এমন কি দুটো বাদে সকল পাটকল পশ্চিম বাংলায় অবস্থিত।

www.pathagar.com

পূর্ববাংলায় খাদ্য ঘাটতি দাঁড়াবে ২২৫০০০ টন। যদি পূর্ব বাংলাকে সঠিকভাবে খাওয়াতে হয়, তবে কমপক্ষে ৮ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হবে। পূর্ব বাংলার একমাত্র ফসল পাট। তারা এখন পাটের পরিবর্তে খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিকে যাবে। যদিও তার ফলে কলকাতার পাটকলগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।" প্রথমদিকে মাউন্টব্যাটেন, গর্ভনর বারোজ ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। আশা করেছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টা সফল হবে। এ আশা নিয়ে তিনি গভর্নর বারোজকে লিখেছিলেন, "তাঁর স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা অর্জনের লক্ষ্যে সোহরাওয়ার্দীকে হিন্দুদের সহযোগিতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য তাঁর চেষ্টা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।"

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লী গমন করেন এবং মুসলিম লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে আলোচনা করেন। জিন্নাহর সম্মতি লাভের পর সোহরাওয়ার্দী লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ ও মাউন্টব্যাটেনের সাথে সন্তোষজনক আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে সন্ধ্যায় দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী ডোমিনিয়ন মর্যাদায় স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করে বিবৃতি দেন। তিনি স্বাধীন বাংলার পক্ষে বিস্তারিত তথ্য পরিসংখ্যানসহ যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন ঃ I have visualised all along, Bengal as an independent state and not part of any Union of India.

এই ভাষণ অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় ঐ দিনের প্রথম খবর হিসেবে ছাপা হয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য মহলবিশেষ থেকে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ যে হিন্দুদের একটি শ্রেণী মনে করে, বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় তাদের যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলা বিভাগের দাবিটি হিন্দুসম্প্রদায়ের একাংশের তীব্র হতাশা থেকে উদ্ভুত বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এমন কি হিন্দুস্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্গ-বিভাগ আত্মহত্যার শামিল হবে। তিনি বঙ্গ বিভাগ দাবির বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, স্বাধীন বাংলা হবে ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও সমৃদ্ধশালী দেশ– সেখানে জনগণ উন্নত জীবনযাত্রার মানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং সেখানে একটি মহান জাতি তার উৎকর্ষের শীর্ষতম সোপানে উপনীত হতে সক্ষম হবে। সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্যে–ভরা একটি দেশ হবে এই বাংলা। বাংলা স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর বাঙালি জাতিই হবে বাংলার ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। যারা বাংলা বিভাগের ধারণা তুলেছেন তাদের কাছে এ চরম অশুভ দাবিটি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দী আরো বলেন, "সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই এমন একটি প্রশাসন উদ্ভাবন করা যাবে, যা জনগণের সকল অংশের মনঃপূত হবে এবং বাংলার হারানো গৌরব ফিরে পাবার পথ প্রশস্ত হবে।" বাংলার হিন্দুরা শুধু যদি সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলার আদর্শটি গ্রহণ করে, তাহলে তিনি তাদের দাবি-দাওয়া পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করার আশ্বাস দেন।

স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা জিন্নাহর আশীর্বাদপুষ্ট কি না– সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমার নিজের মনের কথাই বলছি, আমি বাংলার হয়ে বাংলার কথা বলছি। আমি বিভক্ত ভারতে একটি অবিভক্ত, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলছি।"

সাংবাদিকদের তরফ থেকে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, বাংলা বিভাগ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়েই পড়ে তবে পূর্ববাংলায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপিত হতে পারে কি-না। তার জবাবে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেন যে, কেন পারে না তার কোন যুক্তি তিনি দেখতে পান না। তিনি আরও বলেন যে, পূর্ব বাংলা ও আসামের যে অংশ পাওয়া যাবে তার সমন্বয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

২৭ এপ্রিল তারিখে সাংবাদিক সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী প্রদত্ত বিবৃতি

"বাংলার সমৃদ্ধি ও কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রই এটা লক্ষ্য করে মর্মাহত হবেন যে, বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে একটা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কিছুসংখ্যক হিন্দুর চরম হতাশা ও তজ্জনিত ধৈর্যচ্যুতি, কারণ প্রদেশে তাদের সম্প্রদায় জনবহুল, তাদের সম্পদ, প্রভাব, শিক্ষা-দীক্ষা, প্রচারণা ও প্রশাসনযন্ত্রে তাদের প্রাধান্য এবং তাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সত্ত্বেও বঙ্গীয় মন্ত্রীসভায় তারা যথোপযুক্ত অংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।"

"এই নৈরাশ্যের প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, বাংলাদেশ যে ধরনের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে বলে আমি আশা করছি সে ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে বর্তমান অবস্থায় অব্যাহত থাকতে পারে না, সেটা তারা বুঝতে পারছেন না। আমরা আজ ভারতে এমন একটি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি, যে সংগ্রামে অখিল ভারত পরিধিতে কয়েকটি বিরোধীয় শক্তি একের ওপর অন্যের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয়ার মরণপণ চেষ্টায় লিপ্ত, কিন্তু প্রত্যেক পক্ষই নতি স্বীকারের জন্য এমন মূল্য দাবি করছে, যা প্রতিপক্ষ দিতে প্রস্তুত নয়।

"তাদের বিরোধসমূহে সকল প্রদেশের রাজনীতিই গভীরভাবে প্রভাবিত এবং

www.pathagar.com

সেই ক্ষেত্রে প্রদেশগুলির সমস্যাবলীও সমষ্টিগতভাবেই বিবেচ্য। কিন্তু যখন প্রত্যেকটি প্রদেশকেই এককভাবে নিজের সমস্যাবলীর মোকাবেলা করতে হবে, এবং প্রত্যেকটি প্রদেশই পূর্ণত্ব না হলেও কার্যত স্বাধীন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন অবশ্যই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে, এবং বাংলার জনগণকে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে হবে।

"এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য যে এই রকম একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলায় এমন একটি মন্ত্রীসভা টিকে থাকতে পারবে যে মন্ত্রীসভা বাংলার সকল প্রধান সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে গঠিত হবে না কিংবা যা হবে একটি মাত্র সাম্প্রদায়িক দলের সমন্বয়ে গঠিত কিংবা যাতে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব বর্তমান অপেক্ষা উন্নততর হবে না। আমার মনে হয় না যে, মুসলমানেরা তাদের সামান্য সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু মন্ত্রীসভায় কিঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করলে হিন্দুরা তাতে ক্ষুন্ন হবেন, কেননা বাংলার বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা অনিবার্য বলে তাঁরা ইতিপূর্বেই মেনে নিয়েছেন।

"এমতাবস্থায়, বাংলার জনসাধারণের একটি অংশ, যথা মুসলিমসম্প্রদায়, অপর একটি যথা হিন্দুসম্প্রদায়ের উপর জুলুমশাহি কায়েম করতে পারবে বলে সত্যি কি কেউ কল্পনা করতে পারেন? এই রকম জুলুমশাহির অসম্ভাব্যতা ও অবিশ্বাস্যতার একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত ধরা যাক হিন্দুদের অভ্যন্তরীণ শক্তির কথা। এই শক্তির সুবাদে তারা যে কোনো জালেম সরকারকে পঙ্গু করে ফেলতে পারেন। প্রশাসন ব্যবস্থার সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদেই তারা অধিষ্ঠিত রয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীতে তাদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা, সেক্রেটারীয়েটে ক্ষমতার রজ্জুটি তাদেরই হাতে ধরা। সরকারের সবচাইতে প্রভাবশালী ও ঝানু আমলাদের সবাই হিন্দু। তাদের পদমর্যাদা ও প্রভাব উপেক্ষা করা যাবে, কল্পনা করাও অবাস্তব।

"এছাড়াও বাংলার সীমান্তে থাকবে ২০ কোটি হিন্দুর অধিবাস। এই প্রদেশে তাদের স্বধর্মীদের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে কি না, সেদিকে তারা নিশ্চয়ই নজর রাখবে। বাংলার হিন্দুদের প্রতি কোনোরকম জুলুম-অবিচার করা কোনো মুসলিম সরকারের পক্ষে আহাম্মকি বৈ কিছু হবে না এবং তেমন আহাম্মকি হবে আত্মহত্যারই শামিল।

বাংলার হিন্দুসমাজের প্রতি সরকারের তথাকথিত অসদাচরণ সম্পর্কে চরম বিষোদ্‌গারে ভরা অভিযোগ পড়েছি। এসব অভিযোগ খুবই নাজুক ও কাল্পনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমি এ-কথা কোনোক্রমেই স্বীকার করবো না যে, বঙ্গ বিভাগের দাবি, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ হিন্দু সমর্থন করেন, সমগ্র বঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুর কথা ছেড়েই দিন।

www.pathagar.com

বাংলার অঞ্চল নির্বিশেষে হিন্দুদের সংস্কৃতি ও নাড়ির সম্পর্ক এত গভীর ও অবিচ্ছেদ্য যে, এমন কি অঞ্চলবিশেষে ক্ষমতা দখলের আশাতেও এই সম্পর্কচ্ছেদ করা তারা তাদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা করবেন না।

বস্তুত, অনুরূপ কারণেই বঙ্গ বিভাগ প্রশ্নে বাংলার হিন্দু, মুসলমান, তফসিলি নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি বঙ্গ-বিভাগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কেবল তা হলেই বাংলাকে ভাগ করা যাবে। অর্থনৈতিক অখণ্ডতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বাংলার ক্ষেত্রে এইসব মৌলিক কারণের জন্যই ভারত বিভাগের মুসলিম দাবি থেকে বঙ্গ ভাগের প্রশ্নটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করতে হবে।

বঙ্গ বিভাগের দাবিতে হিন্দু মহাসভা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা আশা করছে যে, বঙ্গ বিভাগের দাবিতে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুললে, বাংলা সরকারের পতন ঘটিয়ে ৯৩ ধারা জারির পর একাধিক আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্মোন্মত্ততা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তারা হিন্দুসমাজের আনুকূল্য লাভ ও সেই সুবাদে কংগ্রেসের প্রভাব নির্মূল করতে পারবে। হিন্দু মহাসভা পুনরায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের অভিলাষী। তেমনি অভিলাষী রয়েছেন আরো অনেক রাজনীতিক, যাঁরা এ-যাবৎ রাজনীতিক্ষেত্রে ইঞ্চি পরিমাণ ঠাঁই করে নিতেও অসমর্থ হয়েছেন।

হিন্দুসমাজের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের হোতা। এ-কথা সত্যি যে তাদের পেছনে রয়েছে একটি প্রভাবশালী পত্রিকা মহলের সমর্থন এবং প্রচারণার ক্ষেত্রে তাদের পারদর্শিতা অদ্বিতীয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের অণুমাত্র সমর্থন নেই তাদের আন্দোলনের পেছনে। গত নির্বাচন সংশয়াতীতরূপে সপ্রমাণ করেছে যে, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস দলের মধ্যে কোনোটিই তফসিলি সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধিত্ব করে না। যুক্ত নির্বাচনে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন প্রার্থীরা পরাজিত হলেও প্রাথমিক নির্বাচনে তারা কংগ্রেস মনোনীত তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীদের চাইতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন।

এ ছাড়া, বর্ণহিন্দুদের মধ্যেও এমন কয়েকটি শ্রেণী আছে, যারা আনুষ্ঠানিকভাবে, বর্ণহিন্দু বলে চিহ্নিত হলেও কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার অনুসারী নয়। অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন অপেক্ষা সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েম হলেই এরা বেশি সুখী হবে। কংগ্রেস কিংবা হিন্দু মহাসভার পরিচালিত সরকার যে বিশেষ অধিকারভোগী শ্রেণীগুলির স্বার্থেই

www.pathagar.com

পরিচালিত হবে, সে সম্পর্কেও এরা অবহিত, কারণ সেই শ্রেণীগুলো হচ্ছে এসব দলের শক্তির আসল উৎস।

কাজেই বঙ্গ বিভাগের দাবিটি হিন্দুদের মধ্যে তত ব্যাপক ও সার্বজনীন নয় যতটা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যদিও প্রচারণার ঢক্কা-নিনাদে এর উল্টোটাই প্রতিপন্ন করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বঙ্গভঙ্গের দাবি সমগ্র বাংলায়-কিংবা, এমন কি শুধু পশ্চিমবঙ্গে- প্রকৃত প্রস্তাবে কতখানি জনসমর্থনপুষ্ট হতে পারে।

"তবে তার আগে বঙ্গভঙ্গ দাবির গ্রাহ্যতার প্রশ্নটি আরেকবার পরখ করে দেখা যেতে পারে। বাঙালি হিন্দুরা কেন একটি স্বতন্ত্র আবাসভূমি দাবি করতে যাবেন?

"তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যে দাবিটি শুধু মুষ্টিমেয় কয়েকজন বর্ণহিন্দুর নয়, বরং নির্বিশেষে সকল বর্ণহিন্দু তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু ও অঘোষিত বর্ণহিন্দুদের বর্তমান প্রশাসনের অধীনে তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি; তাহলে কী করে তারা ভাবতে পারেন যে, ভবিষ্যতে কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থাধীনে তারা দুর্গত হবেন এবং তাঁদের জীবন, সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য একটি ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের পত্তন অপরিহার্য? আমার তো মনে হয় হিন্দুদের নিজস্ব স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকেই এই দাবির প্রতিষ্ঠা আত্মঘাতী হবে। এমন কি যদি এমন একটি কল্পনাতীত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেখানে বাংলার সমগ্র শাসন ক্ষমতা পুরোপুরি মুসলমানদের কব্জাগত হয়ে যায় এবং সে কারণে গোটা হিন্দু সমাজ একটি নিরেট বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সেই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে অনুরূপ একটি মুসলিম সরকার কি তাদের নীতি কার্যকর করতে পারেন- সরকারি চাকুরেদের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিল্প, বাণিজ্য ও সকল পেশাও তাদের হস্তগত। তাদের যুবশ্রেণীও অগ্রসর, অধিকার সচেতন ও দাবি আদায়ে সক্ষম। কাজেই, বঙ্গভঙ্গের দাবিতে সূচিত মনোবৃত্তি ও শুধু অধৈর্য, নৈরাশ্য ও অদূরদর্শিতাপ্রসূত নয়, এটি এমন একটি গভীর পরাজয়বাদী মনোভাবের দ্যোতক, যা বাংলার মহান হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কেউ আশা করতে পারেন না।

"অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষৎ কাঠামোতে কি পরিণাম আশা করা যেতে পারে তার নির্দেশক হিসেবে প্রায়ই নোয়াখালীর ঘটনার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। আগেই বলেছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ভুত কোনো ঘটনার নিরিখে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের প্রয়াস হাস্যকর হবে। তবুও ঘটনাটি বিচার করে দেখা যাক। নোয়াখালীতে অনুষ্ঠিত ঘটনাকে কি ভবিষ্যতের মানদণ্ড ও পূর্বগামিনী ছায়া বলে

www.pathagar.com

বিবেচনা করা যায়? আরো কি অগণিত জেলা নেই যেখানে মুসলমানেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যাগরিষ্ঠ? সেসব জেলায় কি শান্তি অব্যাহতরূপে বিরাজমান নেই এবং হিন্দুরা পূর্বের মতোই নিজেদের অধিকারও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নেই?

"এবার আসুন ভেবে দেখি বাংলা অবিভক্ত থাকলে তার অবস্থান কি হবে। বাংলা হবে একটি মহান দেশ, ভারতের মধ্যে সবচাইতে ধনাঢ্য ও ঋদ্ধিশীল রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র তার অঙ্কে লালিত জনগণকে দিতে পারবে এক সমুন্নত জীবনযাত্রার মান, যেখানে এক মহান জাতি তার বিকাশের উন্নততম সোপানে আরোহণ করতে পারবে, এবং সত্যিকার অর্থে প্রাচুর্যে ভরা হবে যে দেশ। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে হবে সমৃদ্ধিশালী, এবং কালের আবর্তনে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে সেই দেশ। বাংলা যদি অবিভক্ত থাকে তাহলে তার এই ভবিষ্যৎ কল্পরূপ শুধু স্বপ্ন-বিলাস বা আকাশ কুসুম চিন্তা মাত্রে পর্যবসিত হবে না। বাংলার অন্তর্নিহিত সম্পদ ও তার উন্নয়নের বর্তমান পর্যায় সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন যে, এই হবে ভবিষ্যতের বাংলার রূপ, যদি না তার আগেই আমরা স্বখাতসলিলে ডুবে মরি।

"আমি বরাবরই বাংলার ভবিষ্যৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কল্পনা করে এসেছি, কোনোরূপ ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের অংশ হিসেবে নয়। অনুরূপ কোনো রাষ্ট্র একবার সংস্থাপিত হলে, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার ওপরেই। আমি কখনোই ভুলতে পারব না ভারত সরকারের কত দীর্ঘদিন লেগেছিল ১৯৪৩ সালের বাংলার মনন্তরের গুরুত্ব অনুধাবন করতে, কীভাবে বাংলার চরম দুর্দিনে প্রতিবেশী বিহার প্রদেশ তাকে খাদ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিল, কীভাবে ভারতের আর সব কয়টি প্রদেশ বাংলার প্রতি তাদের দ্বার রুদ্ধ করে রেখেছে ও বাংলাকে তার নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করে চলেছে, কীভাবে ভারতের দরবারকক্ষে বাংলাকে ঠেলে দেয়া হয় মর্যাদার-আলোক-বঞ্চিত এক অখ্যাত কোণে আর অন্য প্রদেশগুলো তাদের আসন দখল করে বসে দোর্দণ্ড প্রতাপে।

"বাংলা যদি মহান হতে চায়, তবে সে শুধু নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তা হতে পারবে। তাকেই নিজের সম্পদের অধিকারী ও নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে হবে। বাংলার ওপর অন্যের শোষণের উচ্ছেদ করতে হবে, ভারতের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বাংলাকে বলি দেয়া আর চলবে না। শেষ পর্যায়ে বিরোধ বাধবে কলকাতা ও তার অব্যবহিত পরিপার্শ্বকে ঘিরে। কারণ, প্রধানত অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত লোকদের অবদানেই গড়ে উঠেছে কলকাতা; বাংলার মাটিতে তাদের কোনো শেকড় নেই, তারা এখানে এসেছিল শুধু জীবিকার্জন করতে, কিংবা, অন্য দৃষ্টিতে, বাংলাকে শোষণ

www.pathagar.com

করতে। কিন্তু বড়ই আফসোসের কথা, ওপরে আলোচিত পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে, এই যদি হয় বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য, তা হলে এই আন্দোলন শুধু এই উদ্দেশ্যের স্থির বিন্দুতেই সীমিত থাকবে না, অচিরে এই বিভাগের ভ্রূণ থেকেই জন্ম নেবে এমন বৈরিতা ও জিঘাংসা, যার শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কেউ তা জানে না। কাজেই হিন্দু সমাজের যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক এত হাল্কাভাবে বাংলাকে ভাগ করার কথা বলে, তাদের কাছে আমাদের আবেদন : অশেষ ক্ষতি ও দুর্ভোগের ধাত্রী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করুন। আমরা সকলে একাত্ম হয়ে উদ্যোগী হলে নিশ্চয়ই এমন একটি ভবিষ্যৎ শাসন-প্রকল্প উদ্ভাবন করতে পারব, যা জনগণের সকল অংশের সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে ও বাংলার সমৃদ্ধ সমুজ্জল গৌরবদীপ্ত অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারবে।"

সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে দৈনিক আজাদ (এপ্রিল ২৯, ১৯৪৭) মন্তব্য করে যে, সম্মেলনে ভারতীয়রা ছাড়াও বহু বৃটিশ ও মার্কিনী সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তবে ভারতীয় হিন্দু সাংবাদিকগণই বেশী প্রশ্ন করেন। প্রায় দেড় ঘন্টাকাল প্রশ্নোত্তর সভাকে মনে হচ্ছিল রাজনৈতিক বিতর্ক সভা। সোহরাওয়ার্দী একবারও ক্ষেপে যাননি-সহাস্যবদনে ধৈর্যের সাথে সকল প্রশ্নের জবাব দেন।

দৈনিক আজাদ-এর প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়েছে যে ঃ 'মিঃ সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, বিভক্ত বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান কাহারও কোনও সুবিধা হইবে না। এমতাবস্থায় তিনি বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে মুসলমান নেতাদের সহিত গোলটেবিল বৈঠকে একত্রে বসিয়া আলোচনার জন্য হিন্দু নেতাগণকে আহ্বান করেন। তিনি হিন্দুদিগকে অহেতুক সন্ত্রস্ত হইতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন যে, বিহারের বাংলাভাষাভাষী জেলাসমূহ যদি বাংলার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয় তবে এরূপে গঠিত নতুন প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫১ জনের বেশী হইবে না। মিঃ সোহরাওয়ার্দী বাঙালিদের জন্য পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবী করেন।

স্বাধীন বাংলার জন্য কোনও শাসনতন্ত্র মিঃ সোহরাওয়ার্দী রচনা করিয়াছেন কিনা সে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, তাঁহার পক্ষে উহা একা সম্ভব নহে, বাংলার শাসনতন্ত্র রচনা করার দায়িত্ব বাঙালি জাতির।'

সোহরাওয়ার্দীর নতুন প্রস্তাবের ফলে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সদস্যগণ মনে করেন যে এমন রাষ্ট্র আমরা সমর্থন করতে পারি না যেখানে মুসলমানরা সমান সমান বা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। কলকাতায় মুসলিম লীগের ঘরোয়া সভায় সমালোচনার ঝড় ওঠে। আবুল হাশিমের অনুরোধে সকলেই প্রকাশ্য সমালোচনা

www.pathagar.com

থেকে বিরত থাকেন। কি কারণে সোহরাওয়ার্দী এ ধরনের প্রস্তাব করেছেন সে বিষয়ে তাঁকেই জিজ্ঞেস করা উচিত বলে ঘরোয়া সভা সিদ্ধান্ত নেয়। এ ধরনের প্রস্তাবে বিচলিত হবার কারণও কিছুটা ছিল বৈকি। সোহরাওয়ার্দী ঐ সংবাদ সম্মেলনে আরো বলেছিলেন যে, "বাঙালি হিন্দুগণ যদি অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার নীতি গ্রহণ করে তবে তাহাদের দাবি মিটাইবার জন্য আমি অনেকদূর অগ্রসর হইতে রাজী আছি" তিনি আরো বলেছেন, "বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ বর্তমান অবস্থার অনুরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎ বর্তমানেরই পুনরাবৃত্তি হইবে এইরূপ ধারণা করিবেন না।" হিন্দুদের দাবি মেটানো এবং সেই অনুসারেই বাংলার নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো হবে নতুন শাসনতন্ত্র মোতাবেক, এটাও মুসলিম লীগের একটি অংশের কাছে দুর্ভাবনার বিষয় ছিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব থেকে সোহরাওয়ার্দী খানিকটা সরে গেছেন বলে তাদের ধারণা জন্মে। উদারপন্থীদের বক্তব্য ছিল অখণ্ড সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠায় সোহরাওয়ার্দীর পন্থাই যুগোপযোগী। সোহরাওয়ার্দী আধুনিক চিন্তা করেছেন। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এমনভাবে হতে হবে যে, ক্রমেই দেশ থেকে হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্রবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শে একটি আধুনিক বাঙালি নেশন গড়ে উঠবে।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে কায়েদে আজম ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলোচনার পর ২৮ এপ্রিল (১৯৪৭) কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই দিনই ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শরৎচন্দ্র বসুর সহিত যোগাযোগ করে বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী ছাড়াও খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম ও ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। এ বৈঠকে শরৎচন্দ্র বসু বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েক দফা প্রস্তাব পেশ করেন।

মুসলিম লীগের মধ্যে যে জটিলতাই থাক না কেন তফশিলি সম্প্রদায় কিন্তু যুক্তবাংলার বিষয়ে অদমনীয় ছিলেন। তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল অখণ্ড বাংলা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এমন দলিল নেই বললেই চলে। বিচ্ছিন্নভাবে দু'একজন অখণ্ড বাংলার বিরোধীতা করছিলেন বৈকি কিন্তু সম্প্রদায়গতভাবে শুধু পূর্ববঙ্গেই নয়, পশ্চিমবঙ্গেও তফশিলি সম্প্রদায় অখণ্ড বাংলার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছিল।

কলকাতা তফশিলি বণিক সমিতির সেক্রেটারি দেশনারায়ণ রায়ের বিবৃতিটি এখানে তুলে দেয়া হলো ঃ "আমরা বাংলার তফশিলিভুক্ত জাতির অধিবাসীগণ বর্ণহিন্দুদের বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে বিশেষ আশ্চার্যান্বিত হইয়াছি। ইহার কি কারণ থাকিতে পারে তাহা আমরা বাংলায় নিপীড়িত জনগণ উপলব্ধি করিতে

www.pathagar.com

অক্ষম।

আমরা কোনও মতেই এমতাবস্থা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ উহা কার্যকরী হইলে বর্তমান জগতের সকল প্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থা হইতে আমরা সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হইব।

মুসলমান ও তফশিলি জাতি বর্তমানে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে বর্ণহিন্দুগণ সংখ্যালঘু হইয়া পড়ায় তাহারা স্বাভাবিকভাবে একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ তফশিলি জাতিকে আবার এক দুর্যোগের মধ্যে ফেলিবে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে বহু তফশিলির বাস। এই পরিকল্পনায় তাহাদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইবে।

বঞ্চিতদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিলেই আমাদের স্বার্থ রক্ষা হইবে। এমতাবস্থায় বর্তমানে আমাদের অভিমত প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করি। আমরা কোনও মতেই বঙ্গভঙ্গের দাবি সমর্থন করি না। তফশিলি জাতি বৃহত্তর বাংলা সমর্থন করে। আমরা বাংলাকে এমনভাবে গড়িতে চেষ্টা করিব যেখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহাদের ন্যায্য দাবি অনুসারে সকল ক্ষেত্রেই অধিকার লাভ করিবে।"

দেশনারায়ণ রায়ের এ বিবৃতিটি পশ্চিমবঙ্গে ঝড় তুলেছিল। তাঁর এ বিবৃতি দৈনিক আনন্দবাজার, দৈনিক আজাদ ও অমৃতবাজার–এ ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল ছাপা হয়। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় পত্রিকাগুলোতে শত শত চিঠি আসতে থাকে এ সম্পর্কে। অনেক তফশিলি চিঠি লিখে জানায় তারা মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। আবার কেউ কেউ বর্ণহিন্দুদের নিষ্ঠুরতার উপমা দিয়ে কালসাপের সাথে একই গুহায় বাস করা সম্ভব নয় বলে অভিমত প্রকাশ করে। বর্ণ হিন্দুরাও অনেক চিঠি লিখেন। কেউ কেউ তফশিলিদের ভর্ৎসনা করেন আবার কেউ কেউ বলেন হিন্দু জাতির মধ্যে কোনো বর্ণবিভেদ নেই। তফশিলিদের বর্ণহিন্দুদের সাথে গ্লানি ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। তবে এতে আর যাই হোক-তফশিলী জাতিও নড়েচড়ে উঠেছিল এবং নিজেদের মধ্যে ঐক্য সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশে তখন দাঙ্গা অবস্থাও বিরাজ করছিল। ঢাকাতেই মূলত দাঙ্গা ফ্যাসাদ একটু বেশিই হতো। এ শহরে ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই হিন্দুদের সংখ্যা মুসলমানের সমান সমান ছিল। দাঙ্গায়ও সমান সমান যেত। ঢাকায় এপ্রিল মাসে টুকটাক দাঙ্গা লেগেই ছিল, গ্রামেও মাঝে মধ্যে দাঙ্গা হতো। তবে ঢাকা শহরে এপ্রিলের শেষে হঠাৎ করেই বড় রকমের দাঙ্গা শুরু হলো। দেখা গেল মুসলমানগণ দাঙ্গায় তফশিলিদের উপরও আক্রমণ চালাচ্ছে। বিশেষ করে স্বর্ণের

www.pathagar.com

দোকান লুট করার প্রবণতাই বেশি। আর বর্ণহিন্দুদের লক্ষ্যস্থল বার লাইব্রেরির মুসলমান এডভোকেটগণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ঢাকার দাঙ্গা বিষয়ে অনেকেরই ধারণা, ঢাকার দাঙ্গা ছিল সর্বতোভাবেই পরিকল্পিত। কামরুদ্দীন আহমদের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ই ঢাকায় বেশি দাঙ্গা হতো। আরেকজন গবেষকের মতে বর্ণহিন্দুরা সূচনা থেকেই ঢাকা শহরটাকে কবজা করতে চাইতেন–কলকাতা তো তাদের দখলে আছেই। আবার মুসলমানরাও যারা দাঙ্গায় অভ্যস্ত ছিলেন তাদের কাজ ছিল ঢাকায় মুসলিম প্রাধান্য রক্ষা করা। ১৯৪৭ সালের ৩০ এপ্রিল ঢাকার দাঙ্গা থামানোর জন্য পুলিশকে ৭২ ঘন্টার কারফিউ বলবৎ করতে হয়েছিল। ঐদিন ৩ জন নিহত ও ১৩ জন আহত হবার খরব পাওয়া যায়।

শরৎ বসুর দলভুক্ত কংগ্রেসের একদল যুবক তদানীন্তন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের সঙ্গে বর্ধমানে দেখা করে বলেন যে বাংলা বিভক্ত হতে যাচ্ছে। আবুল হাশিম কলকাতা এলে ২৮ এপ্রিল যুক্তবাংলার পক্ষে এক বিবৃতি দেন, যা ২৯ এপ্রিল প্রকাশ করা হয়।

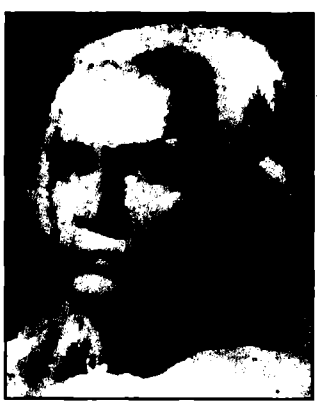
আবুল হাসিম

তিনি যুক্তবঙ্গের পক্ষে আবেদন জানিয়ে বলেন, Time has come when truth must be told. Surrendering to vulgar thinking for cheap popularity and opportunist leadership is intellectual prostitution. ..... Bengal today is standing at the cross roads– one leading to freedom and glory and the other to eternal bondage and abounding disgrace. Bengal must make a decision here and now. There is a tide in the affairs of men which taken at the floods leads on to fortune. Opportunity once lost may come no more. ("সময় হয়েছে সত্যকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত করার, শস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য সুবিধাবাদী নেতৃত্ব ও বিকৃত চিন্তার নিকট আত্মসমর্পণ করা প্রজ্ঞার ব্যাভিচার। ... বাংলা আজ তার ভাগ্যের এক ক্রান্তিলগ্নে সমুপস্থিত। তার সামনে দুটি সোজা পথ– একটি স্বাধীনতা ও গৌরবের, অন্যটি অনন্তকালের জন্য দাসত্ব শৃংখল ও অশেষ নির্যাতনের।

www.pathagar.com

বাংলাকে এখানেই এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মানুষের জীবনে কখনো কখনো এমন শুভলগ্ন দেখা দেয় যে লগ্নের মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা আরম্ভ হলে তা পরম সৌভাগ্যের অব্যর্থ লক্ষ্যেই সমাপ্ত হয়। সুযোগ একবার হারালে আর কখনো নাও আসতে পারে।")

আবুল হাশিম তার বিবৃতিতে বলেন, Hindus and Muslims of Bengal, preserving their respective entities, had by there joint efforts. in perfect harmony with the nature and climatic influence of their soil, developed a wonderfull common culture and tradition which compare favourably with the contribution of any nation of the world in the evolution of man. (বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানরা তাদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখে নিজেদের দেশের প্রকৃতি ও আবহাওয়ার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে এক অপূর্ব সাধারণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছিলেন যা মানব বিবর্তনে পৃথিবীর যে কোন জাতির সাথে সহজেই তুলনীয়।)

আবুল হাশিম হিন্দুদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, But in a divided Bengal, West Bengal is bound to be treated as far-flung province, possibly colony, of alien indian imperialism. However high they may pitch their expectation on partition it is crystal clear to me that the Hindus of Bengal shall be reduced to the status of daily wage-earner of an alien capitalism.

[কিন্তু বিভক্ত বাংলায় পশ্চিম ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ একটি সুন্দর প্রদেশে, সম্ভবত একটি কলোনিতে পরিগণিত হবে। বঙ্গভঙ্গের সাথে তারা যতই নিজেদের প্রত্যাশা গ্রথিত করুন, এটা আমার কাছে দিবালোকের মত পরিস্কার যে বাংলার হিন্দুরা বিদেশী পুঁজিবাদের দিনমজুরের পর্যায়ে উপনীত হবে।

১৯৪০ সালের লাহের প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি ঐ বিবৃতিতেই উল্লেখ করেন যে, Partition of Bengal bears no analogy to the partition of India. The lamentsble perversion in thinking which suggests that the movements for the partition of Bengal is convenient counterblast to Pakistan arises out of a colossal ignorance of the contents and implications of the Lahore Resolution to which and which alone and not this or that interpretation there of. Muslims of India owe allegiance. That resulution never contemplated the creation of any 'Akhand' Muslim state or any

www.pathagar.com

artificial Muslim Majority either by forcible importation of alien elements as is being done in palestine or by any mass transference of population as was done between Turky and Greece.

Pakistan never postulates that in Bengal or the Punjab Muslims shall be the ruling race and others reduced to the status of a subject nation. Quaide-e-Azam after the failure of jinnah-Gandhi talks at Bombay had declared in clear and unequivocal terms that free Pakistan states shall be governed and administered by the will and consent of the entire people on the bassis of universal adult suffrage. I will like to add by system of joint electorate if the minorities do not demand separate electorate for their own protection.

ভারত বিভক্তির সাথে বঙ্গভঙ্গের কোন সাদৃশ্য নেই। চিন্তার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যজনক বিকৃতি যার থেকে মনে হতে পারে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পাকিস্তান সংগ্রামের একটি সুবিধাজনক প্রতিবাদ। এ চিন্তা লাহের প্রস্তাবের বিষয় এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বিরাট অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত। এই বিষয় ও গুরুত্বের প্রতিই ভারতীয় মুসলমানরা অনুগত। লাহোর প্রস্তাব অখন্ড মুসলিম রাষ্ট্রের কথা অথবা যেমন প্যালেস্টাইনে বলপূর্বক বিদেশী লোকদের আমদানি করা হচ্ছে অথবা তুর্কী এবং গ্রীসের মধ্যে ব্যাপক জনসংখ্যার স্থানান্তরিত হচ্ছে সেরকম কোনো কৃত্রিম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা চিন্তা করা হযনি।

পাকিস্তান স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয়নি যে বাংলা অথবা পাঞ্জাবে মুসলমানরা শাসক জাতি হবে এবং অন্যেরা পরাধীন জাতির পর্যায়ে পরিণত হবে। বোম্বেতে জিন্নাহ-গান্ধী আলোচনা ব্যর্থ হবার পর জিন্নাহ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রগুলি সার্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সমগ্র জনগণের অভিপ্রায় ও সম্মতি দ্বারা শাসিত ও চালিত হবে।

তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় স্বাধীন ও যুক্তবাংলার প্রতি সমর্থন দান করে বলেন, Intense patriotism for the creation of a united and sovereign Bengal having all the attributes of an independent country, is the remedy and not partition. (যুক্ত ও স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য খাঁটি

www.pathagar.com

দেশপ্রেমের মধ্যে নিহিত রয়েছে এই প্রদেশের বর্তমান সমস্যাসমূহের সমাধান, বাংলা বিভাগের মধ্যে নহে।)

তিনি বাঙালিদের হীনম্মন্যতাবোধ ও পরাজিতের মনোভাব পরিত্যাগ করার আহ্বান জানান। তাঁর বিবৃতি বাংলার ভবিষ্যৎ প্রশ্নে সোহরাওয়ার্দীর ভাবাদর্শের পরিপূরক হয়েছিল। আবুল হাশিমের বক্তব্যটি অমৃতবাজার এবং মর্নিং নিউজ পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল ১৯৪৭ গুরুত্বসহ প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত মহলে এই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা হলেও সাধারণ মহলে এটা তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি।

৩০ এপ্রিল কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘোষণা করেন যে ভারত ভাগ হলে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হতে হবে। ঐ দিনই মি. জিন্নাহ প্রদেশ ভাগের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ভারত ভাগ হতে হবে এবং ৬টি ইউনিট হবে– বাংলা, আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অখণ্ড বাংলার বিরুদ্ধে ছিলেন সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। তিনি সত্যমিথ্যা যা ইচ্ছে বলে বেড়াতেন সর্বত্র অখণ্ডতার বিরুদ্ধে। তিনি এপ্রিল মাসেই এক বিবৃতিতে বলেন যে বাংলায় বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা বেশি।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ডক্টর মুখার্জির এই বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান সাথে সাথেই। বিবৃতির মূল অংশটুকু এখানে দেয়া হলো ঃ

"১৯৩১ ও ১৯৪১ সনের লোক গণনার হিসাব পর্যালোচনা করিলে ডঃ মুখার্জরি উক্তি অসত্যে প্রতিপন্ন হইবে। ১৯৩১ সালে বাংলার মোট ২১৫৭৩৪১৭ জন হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্তদের সংখ্যা ছিল ৯১২৪৯২৫ কিন্তু ১৯৪১ সালের সেন্সাসে মোট ২৬৯৪৮৪১৩ হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে তফশিলিদের সংখ্যা জানাইয়াছেন ৭০৭৮৮৯৭ অর্থাৎ পূর্ব হইতে ১৬ লক্ষ কম, কলিকাতার লোক সংখ্যায়ও তফশিলিদের সংখ্যা এরূপ অস্বাভাবিক হ্রাস দেখানো হইয়াছে। ১৯৩১ সালে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ। ১৯৪১ সালে ২১ লক্ষেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ ৮১ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমতাবস্থায় তফশিলি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা ৮১ ভাগ বৃদ্ধি না পাইয়া ৪০ ভাগেরও অধিক হ্রাস পাইবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। কলিকাতা কর্পোরেশনে একমাত্র ধাঙ্গর মেথরদের সংখ্যাই ৩০ হাজারের অধিক ইহা কি ডঃ মুখার্জি জানেন? ১৯৪১ সালের সেন্সাসে যেখানে বলা হইয়াছিল যে বাংলায় সাধারণভাবে শতকরা ২৩.৩ ভাগ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তদানুসারে তফশিলিদের জনসংখ্যা অন্তত ১ কোটি ১৩ লক্ষ হওয়া উচিত ছিল। আমার মনে হয় তফশিলি জনসংখ্যা শতকরা ২৩ ভাগেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।" (দৈনিক আজাদ শনিবার মে ৩, ১৯৪৭)।

www.pathagar.com

মণ্ডলের বিবৃতির ফলে অবশ্যই একটা ভিন্নতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বাংলার বর্ণহিন্দু ও তফশিলিদের মধ্যে। নিগৃহীত বঞ্চিত তফশিলি হিন্দুরা যখন বর্ণহিন্দুদের দখল থেকে নিজেদের উজ্জীবিত করে তুলছিলেন এবং মুসলিম লীগ সরকারের সহায়তায় নিজেদের সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় করে তুলছিলেন তখনই হিন্দু মহাসভা থেকে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪১ সালে আদমশুমারির সময় তারা বন্ধুর মতো তফশিলিদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বুদ্ধি দিতে থাকেন যে, তারা যেন কোনোক্রমেই নামের সাথে সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ না করেন। অনেকেই বর্ণহিন্দুদের সমাজে সম্মানজনক স্থান পাবার স্বপ্নে তাই করেন। এতে বর্ণহিন্দুগণ–তা তারা হিন্দু মহাসভারই হোক আর কংগ্রেসেরই হোক– লাভবান হলেন এই সংখ্যা বেশি দেখানোর কারণ ছিল হিন্দু ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। তখন অবশ্য যুদ্ধের পর বৃটিশরাজ ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাবে এ রকম রটনা ছিল। আর পাকিস্তান দাবিও তখন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং দেশ ভাগের সময় হিন্দু বেশি দেখিয়ে বেশি দখলের আকাঙ্ক্ষাও হয়তো এর পেছনে কাজ করেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৪১ সালের সে মাসে বর্ণহিন্দুগণ যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলার সাথে বর্ণহিন্দুদের মামলা মকদ্দমাও হয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা সম্পর্কে মুসলিম লীগের মধ্যে দ্বিমত ছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেনের স্বাধীন বাংলার প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। সময় খুবই কম। ২৬ এপ্রিল সাক্ষাতের সময় মাউন্টব্যাটেন সোহরাওয়ার্দীকে বলেছিলেন যে, ২ জুনের পূর্বে তাকে স্বাধীন বাংলার রূপরেখা দিতে হবে। নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু এবং কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায় বাংলা বিভাগের বিরোধী ছিলেন। কিরণশঙ্কর রায় ৩ মে মাউন্টব্যাটেনের সাথে দেখা করে বলেন, বাংলা এক থাকতে পারে যদি মুসলিম লীগ হিন্দুদের পাওনা মিটিয়ে দিতে সম্মত হয়। ভাইসরয় তাঁকে কলকাতায় গিয়ে প্রথমে সোহরাওয়ার্দী ও দার্জিলিং-এ গভর্নর বারোজের সাথে দেখা করতে বলেন। কিরণশঙ্কর রায় তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন।

৩ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাহী কমিটির সভায় বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়। আকরম খাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির এ সভায় গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান, নূরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী এবং ইউসুফ আলী

www.pathagar.com

চৌধুরী। কমিটির ৬ জন সদস্যের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী ও ফজলুর রহমান ছাড়া সকলেই ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুসারী। সে হিসাবে তারা সকলেই ছিলেন আকরম খাঁর মনোভাবেরই প্রতিনিধি। তারাও সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বাংলা ভবিষ্যৎ বিষয়ে একমত ছিলেন না।

সোহরাওয়ার্দী মে মাসের ৪ তারিখে (১৯৪৭) আলোচনার জন্য শরৎ বসুর সাথে যোগাযোগ করেন। বিষয়টি একটু গোপন রাখা হয়েছিল। শরৎ বসুর সাথে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ সাব কমিটির বৈঠকের তারিখটি সঠিক জানা যায় না। তবে সোহরাওয়ার্দীর বাসভবনেই হয়েছিল এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। বৈঠকে শরৎ বসু মুসলিম লীগ সাব কমিটির সামনে ৮টি শর্ত উত্থাপন করেছিলেন। শরৎ বসুই কি প্রস্তাব গুলো নিজে মুসাবিদা করেন নাকি সোহরাওয়ার্দীও সাথে ছিলেন সে কুয়াশা গবেষকরা এখনো ভেদ করতে পারেননি। পরে প্রায় সবগুলো পত্র-পত্রিকায় ঐ ৮টি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। শরৎ বসু বৈঠকে প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করে নাকি বলেছিলেন, এভাবেই একটা অখন্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে– মুসলিম লীগ যদি এগুলো মেনে নেয় তবেই তিনি অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

প্রস্তাবসমূহ

১। বাংলা রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। যুক্তনির্বাচনে ও সার্বজনীন বয়স্কের ভোটাধিকার বলে গণতন্ত্র কাঠামো নির্মিত হবে।

৩। ক ও খ অনুচ্ছেদ মানলে বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠন করতে হবে।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী মুসলমান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দু হতে হবে। মন্তিসভায় ৪ জন মুসলমান ও ৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

৫। বিতর্কমূলক কোনো বিলের খসড়া সংসদে উপস্থাপন করা যাবে না।

৬। সরকারি চাকুরী ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ জন মুসলমান ও শতকরা ৫০ জন হিন্দুর অধিকার থাকবে।

৭। বৃটিশের ক্ষমতা হস্তান্তর অন্তরবর্তীকালীন মন্ত্রীসভার হাতে হতে হবে।

৮। নতুন মন্ত্রীসভার দ্বারা পরবর্তী নির্বাচন হবে এবং নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গণপরিষদ গঠন করা হবে।

প্রস্তাব সম্পর্কে মুসলিম লীগের উপস্থিত সদস্যগণ তখনই কোনো মতামত

www.pathagar.com

জানাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তবে কয়েকজন সদস্যের মত ছিল, এটা ধারণা করা হয়। তবে প্রতিটি প্রস্তাবই সোহরাওয়ার্দীর মতামত বলে আলাপ আলোচনায় প্রকাশ পায়। কেউ কেউ ফিরে এসে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দকে জানান যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তানের বদলে অখণ্ড বাংলার নামে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একমাত্র সোহরাওয়ার্দীকে ফেরাতে পারলেই চলবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ অবিভক্ত বাংলা দাবি করলেও তাদের মধ্যে **মৌলিক** পার্থক্য ছিল। ১৯৪৭ সালের ৩ মে বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন **ঘোষ** বলেন, তাঁরা অবিভক্ত ভারতে বৃহত্তর বাংলা দাবি করেন। মুসলিম লীগ বৃহত্তর বাংলার প্রশ্নে দু দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাবক ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অন্যদিকে খাজা নাজিমুদ্দিন ও মওলানা আকরম খাঁ প্রথমে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করলেও তাঁরা পরে মূল দাবি থেকে দূরে সরে যান। খাজা নাজিমুদ্দিন বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চান। ৫ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্নই ওঠে না। ভারতের মুসলমানেরা একটি মাত্র সুসংহত জাতির অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের সমবায়ে একটি মাত্র সুসংহত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।.... যাঁরা হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত বাঙালি জনতার কথা বলেন এবং সেই ভিত্তিতে স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলার আওয়াজ তোলেন, তাঁরা নিজেদেরকে আমাদের সেইসব শক্তির ক্রীড়নকে পরিণত করেছেন,যারা পূর্ব ও পশ্চিমে হিন্দু প্রদেশের মাঝখানে ফেলে মুসলিম বাংলাকে পিষে মারার কথা খোলাখুলি বলছে।"

এদিকে কলকাতার আনন্দবাজার, অমৃতবাজার ও দৈনিক হিন্দুস্তান পত্রিকা সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের স্বার্থে সরকারকে পত্রিকাগুলোর বিরুদ্ধে আদালতের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হতে হয়। শহীদ সোহরাওয়ার্দী যদিও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেনের সম্মতি নিয়ে স্বাধীন বাংলার আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তবু প্রথম থেকে একমাত্র কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা থেকেই নয়, তার নিজের দলীয় নেতাদের কাছ থেকেও চরম বাধা পেয়েছেন। ৭ মে সোহরাওয়ার্দী তাঁর সমালোচকদের উত্তরে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন বঙ্গভঙ্গ সমভাবে হিন্দু-মুসলমানের ধ্বংসের শামিল। তিনি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিসহ সকল

www.pathagar.com

সমালোচকদের যুক্তি খণ্ডন করে অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলার দাবি করেন। তার বিবৃতিটি সকল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৮ মে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত বিবৃতির মূল অংশ নিম্নে তুলে দেওয়া হলো ঃ

'অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার জন্য আমি আবেদন করিয়াছি তাহার জওয়াবে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পাল্টা বিবৃতি দিয়াছেন। তাহাদের বিবৃতিতে একদিকে মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহ, অপরদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানে মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করিবার স্বপ্নসাধ প্রকাশ পাইয়াছে। এই সুখস্বপ্নের মোহে তাহারা সকল প্রকার প্রযুক্তি ও মুসলমানদের সহিত সহযোগিতা ও আপোসের মনোভাব বিসর্জন দিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন, বিশেষ করিয়া ডঃ মুখার্জি অধৈর্য হইয়া উগ্রভাষা প্রয়োগ করিয়া গালাগালি বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি সগোত্রের সম্মুখে ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বাংলার হিন্দুগণ প্রকৃতই হতভাগ্য এবং ঐক্যবদ্ধ বাংলায় তাহারা সত্যই মৃত্যুভাগ্যের জীবনযাপন করিবে। আমাকে গালাগালি করিয়া, আমার অধিকার সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করিয়া অথবা বাংলার দুর্দশার জন্য আমাকে দায়ী করিয়া কি সুফল হইতে পারে?

তাহারা বাস্তবকে উল্টাইয়া ফেলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ইহা দ্বারা যাহারা সহজেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা, শোষণ ও অপপ্রচারে বিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত তাহাদিগকে উত্তেজিত করা হয়।

..... বাংলা এবং ভারতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। যেহেতু বাঙালিগণ এক জাতি এক ভাষাভাষি এবং বহু বিষয়ে তাহাদের মধ্যে সাধারণ ঐক্য রহিয়াছে সেইহেতু এই উপমহাদেশে যাহারা বাস করিতেছে তাহারাও এক জাতি, এক ভাষাভাষি সমস্বার্থ ও ঐতিহ্যসম্পন্ন। ভারতে এবং অধিকাংশ প্রদেশে হিন্দুগণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যাধিক্য। কিন্তু বাংলায় মুসলমানগণ সংখ্যায় সামান্য অধিক। বৃহত্তর বঙ্গে তাহাদের সংখ্যাধিক্য আরও হ্রাস পাইবে। বাংলায় হিন্দুদের অবস্থা, মর্যাদা ও সংখ্যার দিক বিবেচনা করিলে তাহাদের রক্ষাকবচের প্রয়োজন হইতে পারে না।'

সোহরাওয়ার্দী আরেকটু পরিস্কার করে বলেন যে, তাঁর চিন্তায় অখণ্ড বাংলা পাকিস্তানের অংশ বা প্রতিচ্ছায়া নয়। সর্বোতভাবেই একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এতে তফশিলিগণ আরো সক্রিয় হয়ে উঠলো। ঢাকায় কামরুদ্দীন আহমদ, শামসুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে অখণ্ড বাংলার আন্দোলন সাধারণের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সময় পার হয়ে যাচ্ছিল দ্রুত। মুসলিম লীগের একাংশও আত্মঘাতী হয়ে উঠেছিল সোহরাওয়ার্দীর সমালোচনায়।

www.pathagar.com

এ সময় বাংলার যাদব সম্প্রদায়ও অগ্রসর হন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। আসলে বাংলার অনেকেই ছিলেন ধাঁধার মধ্যে। সুস্পষ্ট রূপরেখার অপেক্ষায় ছিলেন অনেক বাঙালি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক যাদব সম্প্রদায়ের যুগ্ম সম্পাদক মাখনলাল ঘোষ যাদব, উপেন্দ্রঘোষ যাদব, অবনীনাথ ঘোষ যাদব প্রমুখ এক বিবৃতিতে বলেন যে 'আমরা বর্ণহিন্দুদের দর্শনে বিশ্বাস করি না। আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। বর্ণহিন্দুরা যেমন তাদের স্বার্থ বিচার করে আমরাও আমাদের স্বার্থ বিবেচনা করি।' (অমৃতবাজার মে ৯, ১৯৪৭)।

পক্ষে-বিপক্ষে অত্যন্ত দ্রুত জনমত গড়ে উঠছিল। হাটে-মাঠে তর্ক-বিতর্ক ও কংগ্রেসের মধ্যেও দু'দল। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুরা চিন্তিত আরো বেশি, যদি বাংলা ভাগ হয়ে যায় তাহলে পূর্ববঙ্গে যে তারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। এমনকি তফশিলি সম্প্রদায়ও তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে না হিন্দু ভাই বলে। বছরের মধ্যে এত ধন-সম্পত্তি কলকাতায় সরিয়ে নেয়াও তো একটা মুশকিলের বিষয়।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ৮ মে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী খানের কাছে এক পত্রে লেখেন, "যদি বাংলা বিভক্ত হয় তবে উভয় অংশ দুর্বল ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। বেশি হবে আমাদের অংশ, যদিও এর লোকসংখ্যা অনেক বেশি। খাদ্য ঘাটতি এত বেশি যে কোনো প্রকার নিবিড় চাষ ও প্রয়োজনীয় উৎপাদন করতে পারবে না। আমি কোনো প্রকারে উপলব্ধি করতে পারি না যে, একটি দুর্বল পূর্ব বাংলা মুসলমানের জন্য কি উপকারে আসবে অথবা মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি করবে অথবা সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানের সাহায্য করবে।"

১৯৪৭ সালের ৯ মে বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ও বঙ্গভঙ্গ রোধ সম্পর্কে হিন্দু নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সাব-কমিটিকে ক্ষমতা প্রদান করে। সাব-কমিটির ৬জনের মধ্যে ৪ জন ছিলেন খাজা গ্রুপের। তাঁরা সোহরাওয়ার্দীর বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাব থেকে দূরে সরে যান। সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১০ মে ও ১২ মে কলকাতার সোদপুরের আশ্রমে মহাত্মা গান্ধীর সাথে বৃহত্তর বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করেন। আবুল হাশিম, মোহাম্মদ আলী, ফজলুর রহমান ও সোহরাওয়ার্দী গান্ধীর সাথে ভবিষ্যৎ যুক্ত বাংলা নিয়ে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা গান্ধীকে স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব অনুমোদন করার জন্য কংগ্রেসকে রাজি করাতে বলেন। মাওলানা আকরম খাঁ এ পরিকল্পনাকে পাকিস্তানের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করে দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখান করেন। পরিকল্পনাটির সমালোচনা করে ১৪ মে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'বাংলার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মি. শরৎ

www.pathagar.com

বসুর ফর্মূলাটি বাংলার মুছলমানের মুক্তি সংগ্রামকে চিরতরে সমাধিস্থ করিবার জন্যই রচিত হইয়াছে। এই ফর্মূলা গৃহীত হইলে পাকিস্তানের উপর মৃত্যুশেল পতিত হইবে এবং বাংলার সাড়ে তিন কোটি মুছলমান বৃটিশের হাত হইতে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের কবলগ্রস্থ হইবে।" মওলানা আকরম খাঁ বিবৃতিতে শরৎবসু পরিকল্পনার বিভিন্ন দফারও সমালোচনা করেন। প্রস্তাবিত হিন্দু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে তিনি বলেন, "ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যাহাতে বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় দেশের শাসন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব আয়ত্বে রাখিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে যে কোন প্রকারে মোছলেমলীগ মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বরাষ্ট্র দফতর লইয়া মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ফর্মূলার পশ্চাতে ইহাই হইতেছে বর্ণহিন্দুদের চাল।" আকরম খাঁ শরৎবসু পরিকল্পনার সংখ্যা সমতার প্রশ্ন, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি প্রকৃতি বিষয়েরও কঠোর সমালোচনা করেন। উপসংহারে তিনি পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে 'চ্যালেঞ্জ' প্রদান করে বলেন, 'আমি চ্যালেঞ্জ' দিয়া বলিতে পারি, পাকিস্তান পরিকল্পনা ধ্বংসের জন্য যতকিছু চক্রান্তই হউক না কেন বাংলার মুছলমানেরা তৎসমুদয়ের বিরোধিতা করিবে এবং এই ফর্মূলাকে ভিত্তি করিয়াই যদি ভোট গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে শতকরা পাঁচজন মুছলমানও উহা সমর্থন করিবেনা।"

মওলানা আকরম খাঁর উপরোক্ত বিবৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রচেষ্টাকে তিনি পাকিস্তান পরিকল্পনা বাঞ্চালের চক্রান্ত হিসেবে দেখেছেন এবং সেজন্য তিনি এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

সোহরাওয়ার্দী ও রাজস্বমন্ত্রী ফজলুর রহমান ১৪ মে ভাইসরয় ও জিন্নাহর সাথে আলোচনার জন্য দিল্লী গমন করেন। তাঁরা কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ১৫ মে জিন্নাহ ও ভাইসরয়ের সাথে দেখা করেন। তাঁরা কলকাতা ফিরে এলেই মওলানা আকরম খাঁ, নূরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, ইউসুফ আলী চৌধুরী ও হামিদুল হক চৌধুরী দিল্লী গমন করেন এবং ১৮ মে জিন্নাহর সাথে দেখা করেন। তাঁরা জিন্নাহ এবং লীগ হাই কমান্ডের সঙ্গে ১৮ মে এক ঘন্টাব্যাপী আলোচনা করেন। এ আলোচনার পর আকরম খাঁ বঙ্গ-ভঙ্গ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আরও দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯ মে দিল্লীতে ওরিয়েন্ট প্রেসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বাংলার মুছলমান সুনিশ্চিতভাবে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধী। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনকারীদের আমি দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, মোছলেম বাঙ্গালা ঐক্যবদ্ধভাবে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাইবে। বাংলার মুছলমানদের মৃত দেহের উপরই বঙ্গ-ভঙ্গ সম্ভব হইতে পারে।" সাক্ষাৎকারে তিনি সার্বভৌম বাংলা গঠন প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করেন। দিল্লী থেকে ফিরে এসে আকরম খাঁর নেতৃত্বে প্রাদেশিক লীগ নেতৃবৃন্দ স্বাধীন বাংলা

www.pathagar.com

পরিকল্পনাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে প্রচার করতে থাকেন– নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, সোহরাওয়ার্দী কিংবা অন্যকোন ব্যক্তিকে এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেননি। সুতরাং এ সব আলোচনা ব্যক্তিগত প্রয়াস মাত্র। জিন্নাহর অনুমোদন না থাকায় বিষয়টি প্রচারিত হওয়ায় মওলানা আকরম খাঁর নেতৃত্বে জিন্নাহর প্রতি অনুগত লীগ নেতৃবৃন্দ অতি সহজেই স্বাধীন বাংলার প্রবক্তা সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশিমকে বাংলার মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হন।

১৬ মে মাউন্টব্যাটেন বাংলার গভর্নর ব্যারোজকে এক পত্রে জানান যে, হিন্দু-মুসলমান নেতারা একমত হয়ে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারলে তিনি লীগ ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে বলবেন এবং শেষ ঘোষণায় বাংলা বিভক্তি অন্তর্ভুক্ত হবে না। বারোজ সোহরাওয়ার্দীকে কোনো শর্ত আরোপ না করে যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলেন। তিনি ১৯ মে লন্ডনে এক তারবার্তায় জানান যে, "সম্প্রতি বাংলায় দুটি প্রধান দল যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হয়েছে। ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি পৃথক গণপরিষদ নির্বাচিত হবে।" ২০ মে তারিখ অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া কমিটির সভায় মাউন্টব্যাটেন বলেন, বাংলার গভর্নর বাংলাকে একত্রিত রাখার ব্যাপারে সফলভাবে অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলা যদি স্বাধীন হয় তাহলে তৃতীয় ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি ২ জুন তারিখের সভায় স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা অনুমোদন করে, তাহলে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা সংশোধনের ক্ষমতা ভাইসরয়কে প্রদান করা হবে। ইতিপূর্বে সাক্ষাতের সময় মাউন্টব্যাটেন সোহরাওয়ার্দীকে বলেন যে, ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। তবে কংগ্রেস ও লীগ সম্মত হলে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা স্বীকার করে নেয়া হবে এবং পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

শরৎ বসু

অবশেষে ২০ মে শরৎবসুর বাড়ীতে কংগ্রেস লীগ যুক্তকমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। ঐদিন শরৎ বসু তাঁর বাসভবনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং সম্মেলনের সদস্যদের রাত্রিতে তাঁদের এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন। সম্মেলনে মুসলমান প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর

www.pathagar.com

রহমান, মোহাম্মদ আলী, আবুল হাশিম এবং এম.এ. মালিক, অন্যদিকে হিন্দু নেতাদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণশঙ্কর রায় এবং সত্যরঞ্জন বখশী। উল্লেখ্য, মুসলিম লীগ সাব-কমিটির ৬ জন সদস্যের মধ্যে আহ্বায়ক নূরুল আমিন, সদস্য হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী সম্মেলনে উপস্থিত হন নি। তাঁরা ছিলেন খাজা নাযিমউদ্দীনের দলের লোক। সভায় আলোচনা শেষে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু প্রস্তাবিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির সারমর্ম নিম্নরূপ ঃ

(১) বাংলা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। স্বাধীনভাবে এই রাষ্ট্র অবশিষ্ট ভারতের সংগে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে।

(২) গঠনতন্ত্র প্রণীত হওয়ার পর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের যে আইন পরিষদ গঠিত হবে তা যুক্ত নির্বাচন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।

(৩) প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে এবং ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করলে বর্তমান মন্ত্রীসভা বিলুপ্ত হবে এবং এর স্থলে একটি অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। এতে প্রধানমন্ত্রী ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হবে। মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবেন একজন হিন্দু।

(৪) অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মুসলমান ও হিন্দুদেরকে (তফসিলি সম্প্রদায়সহ) সরকারী চাকরিতে সমান অংশ দান করবেন।

(৫) ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্বে ব্রিটিশ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। (৬) রাষ্ট্রের জন্য একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক ৩০ জন সদস্য সম্বলিত একটি কমিটি গঠন করা হবে। এতে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন। আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলেও উদ্ভূত সূত্রগুলোর কিছুটা পরিবর্তন সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরকারীগণ মে মাসের ২০ তারিখের পরেও আলোচনা চালিয়ে যান।

যখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে তখনকার আইন সভায় নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতা, না বৃহত্তর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে তা আলোচনাকারীগণ আলোচনা করেন।

সোহরাওয়ার্দীও জিন্নাহর নিকট চুক্তির একটি কপি প্রেরণ করেন। এই পরিকল্পনাটি জিন্নাহর আশির্বাদ লাভ করে। সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নার মনোভাব সম্পর্কে শেখ মুজিবের লেখা থেকেও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমান

'এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশীর্বাদ ছিল, কিন্তু মিঃ বল্লভ ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে পরিচালিত চরমপন্থী কংগ্রেস মহল এবং মিঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ন্যায় সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করিতে দেয় নাই।' (দ্রষ্টব্য ঃ 'নেতাকে যেমন দেখিয়াছি' শেখ মুজিবুর রহমান, ইত্তেফাক, সোহরাওয়ার্দী সংখ্যা, ১৯৬৪, পৃঃ-১৪৬)

তৎকালীন আসাম উচ্চ পরিষদের সদস্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন ঃ তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট বোস-সোহরাওয়ার্দী চুক্তি সম্পর্কে জিন্নাহর অভিমত জানতে চাইলে সোহরাওয়ার্দী তাঁকে জানানঃ জিন্নাহ সাহেব তাঁকে ফেরৎ টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, যদি বাংলার মুসলমানদের সুবিধা হয় তবে স্বাধীন সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক বাংলা গ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

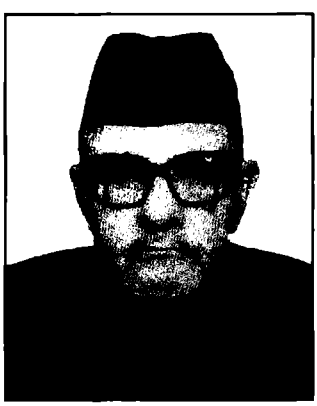

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

তপন রায় চৌধুরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২ জুলাই ২০০৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'বাঙালনামা' প্রবন্ধে বলেন, 'শরৎ বোস, সুরাবর্দি, কিরণ শঙ্কর এই তিনজন পরামর্শ করে সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা করেন। জিন্না সাহেব এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কারণ সম্ভবত তাঁর বরাবরই দুই পাকিস্তান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কতদূর কার্যকরী হবে এ নিয়ে সন্দেহ ছিল। অপর পক্ষে কারও কারও ধারণা যে মুসলমান প্রধান স্বাধীন বঙ্গদেশ কালে কালে পাকিস্তানেই যোগ দেবে– ওঁর এই ভরসা ছিল। কংগ্রেস এ-প্রস্তাবে কখনওই রাজি হয়নি। বলা হয় কলকাতাবাসী অবাঙালি গোষ্ঠী বিশেষের প্রবল আপত্তিই তার কারণ।'

প্রস্তাবিত চুক্তিটির শর্তগুলো সোহরাওয়ার্দী প্রণীত বাংলার গভর্নরকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে উল্লিখিত শর্তের অনুরূপ। সোহরাওয়ার্দী চুক্তির অনুলিপি নবাবজাদা লিয়াকত আলী খানের কাছে প্রেরণ করেন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা কিরণশঙ্কর রায় ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সোহরাওয়ার্দী-শরৎচন্দ্র বসুর চুক্তিটিকে স্বাগত জানান। মুসলিম

www.pathagar.com

লীগের খাজা গ্রুপ চুক্তিকে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ চুক্তির শর্তাবলীর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, চুক্তিভুক্ত যুক্ত নির্বাচন প্রথা অসম্ভব। তাঁর সম্পাদিত দৈনিক আজাদ পত্রিকা চুক্তিকে বাঙালি মুসলমানদের মৃত্যু পরোয়ানা বলে অভিহিত করে। অথচ মওলানা আকরম খাঁ একদা বলেছিলেন, বাংলার মুসলমানদের লাশের ওপর দিয়ে বঙ্গভঙ্গ হবে। আর এখন তিনি বলছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার ক্ষমতা সোহরাওয়ার্দীকে দেয়া হয় নি এবং এই প্রস্তাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কোনো সম্মতি নেই। একথা শুনে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর কাছে চিঠি লেখেন। জিন্নাহ সে চিঠির উত্তর কোনোদিন দেন নি। বঙ্গীয় নিখিল মুসলিম লীগ খাজা গ্রুপের শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রগণ ছিলেন স্বাধীন বাংলার বিপক্ষে। সোহরাওয়ার্দী-পন্থী ছাত্রলীগের নেতা মোয়াজ্জেম উদ্দীন ও নুরুদ্দীন চুক্তিকে সমস্যা সমাধানের পথ হিসেবে চিহ্নিত করেন। শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, আবদুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ এই দলে ছিলেন।

১৯৪৭ সালের ২১ মে জিন্নাহ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলা পর্যন্ত করিডোর দাবি করেন। কংগ্রেস তাঁর দাবির সমালোচনা করে। ২১ মে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল কিরণশঙ্কর রায়কে একটি কড়া চিঠি দেন। তিনি তাতে লেখেন, 'যুক্ত স্বাধীন বাংলা একটি চালমাত্র। হিন্দুরা যদি বাঁচতে চায় তাহলে বাংলাকে ভাগ করতে হবে।' তিনি কিরণশঙ্কর রায়কে কংগ্রেসের নির্দেশ মেনে চলতে বলেন। তারপর থেকে কিরণশঙ্কর রায় স্বাধীন বাংলা আন্দোলন থেকে দূরে সরে যান।

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ২০ মে স্বাক্ষরিত এ চুক্তির নকলসহ শরৎচন্দ্র বসু একখানি পত্র গান্ধীকে পাঠান ২৩ মে তারিখে।

প্রিয় মহাত্মাজী,

আপনার কলকাতা থেকে চলে যাবার পর আমি অনেকগুলো বৈঠক আহ্বান করি যেগুলিতে মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা এবং কিরণ ও সত্যবাবু যোগদান করে ছিলেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (২০ শে মে) আমার বাসভবনে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান (মন্ত্রী), মহাম্মদ আলী (মন্ত্রী), আবুল হাশিম (বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক, বর্তমানে ছুটিতে রয়েছে), আবদুল মালেক (বঙ্গীয় আইন সভায় শ্রমিকদের প্রতিনিধি সদস্য), কিরণ ও সত্য বাবু যোগদান করেন। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এক চুক্তিতে উপনীত হয়েছি এবং আপনার বিবেচনার জন্য একটি কপি সংযোজিত করা হলো। সনাক্তকরণের জন্য সেটি অন্যান্য সকলের উপস্থিতিতে আবুল হাশিম ও আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এটা অবশ্যই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সংগঠনের সামনে উপস্থিত করতে হবে। আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল তার ধারা থেকে আমার মনে হয় যে বাংলার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কথা যদি ধরা যায় তাহলে সাময়িক চুক্তিটি এখানে সেখানে কিছু রদবদল করে তাঁদের দ্বারা অনুমোদিত হবে। সাময়িক চুক্তিটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য আপনার নির্দেশ, সাহায্য ও উপদেশ এবং প্রতিক্রিয়ার বিষয় জানার জন্য আমি খুবই উদ্বিগ্ন রয়েছি। সোদপুরে আপনাকে যা বলেছি তার পুনরুক্তির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। আমার আরও মনে হয়, আপনার সাহায্য উপদেশ ও নির্দেশ অনুসারে সাময়িক চুক্তিটির লাইন অনুযায়ী যদি একটি চূড়ান্ত চুক্তিতে উপনীত হতে পারে তাহলে আমরা বাংলার এবং সেই সঙ্গে আসামেরও সমস্যার সমাধান করতে পারবো। ভারতের অপরাপর অঞ্চলের উপরও এর সুস্থ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আপনি যদি চান দিল্লীতে গিয়ে এ বিষয়ে আরো আলাপ-আলোচনা আপনার সাথে করি। আমার বলা নিষ্প্রয়োজন যে আপনার বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি গিয়ে উপস্থিত হবো। পরিস্থিতি খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং আমার কথা বলতে গেলে, আমার মনে হয় আপনার সাথে আরো আলাপ-আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আমার বিশ্বাস, আপনার বিহার সফরের দরুন শারীরিকভাবে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি আগের থেকে মোটামুটি ভালই রয়েছি।

প্রণামসহ

আপনার স্নেহের

শরৎচন্দ্র বসু (স্বাক্ষরিত)

www.pathagar.com

২৩ মে শরৎবসু লিখিত চিঠির উত্তরে গান্ধীজী ২৪ মে লিখলেন ঃ

প্রিয় শরৎ

তোমার পত্র পেয়েছি। খসড়াটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে, নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা যাবে না। প্রত্যেক আইনের জন্য কার্যনির্বাহীদের এবং আইন সভার হিন্দু সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে। খসড়া চুক্তিটিতে স্বীকৃতি থাকতে হবে যে, বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং তার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। উল্টো খবর সত্ত্বেও লিখিত হতে হবে যাতে করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাবটি সমর্থন করে। দিল্লীতে তোমার উপস্থিতি যদি প্রয়োজন হয় আমি টেলিফোন অথবা টেলিগ্রাফ করবো। কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে খসড়াটি নিয়ে আলাপ করা উচিৎ বলে মনে করি।

তোমাদের

বাপু

গান্ধীর চিঠির জবাবে ২৬ মে ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসু লিখলেন ঃ

প্রিয় মহাত্মাজী,

আপনার ২৪ তারিখের চিঠি গতকাল দেবেন আমাকে দিয়েছেন। তাতে উল্লিখিত প্রস্তাবের জন্য আমি খুবই কৃতজ্ঞ। প্রায় প্রতিদিনই আমরা শর্তগুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছি এবং সেগুলি আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি। গত পরশু কিরণ এবং বঙ্গীয় আইন পরিষদের কিছু সদস্যদের সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। গতরাত্রে আবুল হাশিম ও সত্যবসুর সাথে আলাপ হয়েছে। আলোচনার ফলে শর্তের এক ও দুই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় খসড়া তৈরি করেছি এবং আজ সকালে শহীদের কাছে পাঠিয়েছি। আপনার বিবেচনার জন্য এক অনুচ্ছেদের নতুন খসড়াটির কপি সংযোজিত করলাম।

সরকারের প্রতিটি বিধিবদ্ধ আইনে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ হিন্দু-সদস্যদের সহযোগিতা থাকতে হবে আপনার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে শহীদের সঙ্গে আমি আলাপ করতে পারিনি। তিনি আজ বৈকালে বিমানযোগে দিল্লী রওয়ানা হচ্ছেন। আমি যদি দিল্লীতে যাই তাহলে সেখানে তাঁর সাথে আলাপ করবো। যদি এর মধ্যে তিনি আপনার সাথে দেখা করেন তাহলে এ বিষয়টি উত্থাপন করতে পারেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং বাংলা তার একটি সাধারণ মাতৃভাষাচুক্তিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার ব্যাপারে আপনার পরামর্শ প্রসঙ্গে বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে যে, সে বিষয়ে গত জানুয়ারি মাসে আমি আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম এবং তখন থেকেই আলোচনা করে চলেছি। সে আলোচনার ভিত্তি ছিল এই যে বাংলার সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা এক এবং আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলেই সে ভিত্তির ব্যাপারে একমত। গত মাসে শহীদের অন্যতম প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে তিনি সে কথা স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং শর্তগুলির মধ্যে সে বিষয়ের স্বীকৃতি সংযুক্ত করতে কোন অসুবিধে হওয়া উচিত নয়।

আজকের মত এখানে শেষ করছি।

প্রণাম।

আপনার স্নেহের

শরৎচন্দ্র বোস (স্বাক্ষরিত)

পুনশ্চ ঃ

শহীদ এবং ফজলুর রহমান জিন্নাহর সাথে ও কার্যনির্বাহী কমিটিতে শর্তের বিষয় আলোচনা করবেন। তাঁদের সাথে আলোচনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে, বাংলার কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যদি চুক্তিতে উপনীত হতে পারে, জিন্নাহ তাতে বাধা প্রদান নাও করতে পারেন।

১৯৪৭ সালের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একাংশ সরাসরি সোহরাওয়ার্দীর বিরুদ্ধে মাঠে নেমে গিয়েছিলেন। তারা প্রকাশ্য মন্তব্য করছিলেন যে সোহরাওয়ার্দী একদল তথাকথিত উদার হিন্দুদের সাথে মিলে বাংলার মুসলমানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে পাকিস্তানের পরিবর্তে অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার উদ্যোগ নিয়েছেন। যেখানে তফশিলি জাতি পাকিস্তান সমর্থন করছেন। সেখানে বর্ণহিন্দুদের খপ্পরে পড়ে সোহরাওয়ার্দী সার্বভৌম স্বাধীন বাংলা গঠনের ষড়যন্ত্র করছেন। তফশিলি জাতি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কামিনী প্রসন্ন মজুমদার তাঁর সমর্থন দান বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন যে, বর্ণহিন্দুরা বাংলায় পাকিস্তান বিরোধী প্রচারের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে কোথাও কোথাও নিজেরাই দাঙ্গা বাধিয়ে দিচ্ছে, তাদের পূর্বের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার পেছনে এমন সাম্রাজ্যবাদী চেহারা রয়েছে তা অখণ্ড বাংলা বিরোধী আন্দোলনে প্রকাশ পেয়ে গেছে।

শরৎ বসু তার এবং বাংলার মুসলিম লীগ নেতাদের আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলার পরিকল্পনার দুটি পরিবর্তনের কথা ২৬ মে ১৯৪৭ তারিখে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইন্ডিয়াকে জানান। এ দুটি পরিবর্তনের প্রথমটিতে বলা

www.pathagar.com

হয়েছিল যে, বাংলা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।

স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র ভারতের অন্যান্য অংশের সংগে তার সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। পাকিস্তান কিংবা ভারতে যোগদানের বিষয়টি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের আইন সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে স্থির হবে।

দ্বিতীয় পরিবর্তনে বলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে যৌথ নির্বাচক মণ্ডলী ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে আইনসভা গঠন করার ব্যবস্থা থাকবে। আইন সভায় হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে আসন সংরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকবে।

হিন্দু ও তফসিলীভুক্ত হিন্দুদের আপেক্ষিক জনসংখ্যার অনুপাতে অথবা উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হবে। একাধিক আসন বিশিষ্ট নির্বাচক মণ্ডলী গঠন করা হবে। ভোট পৌনঃপুনিক হবে না, বণ্টনমূলক হবে। যে প্রার্থী নির্বাচনে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সর্বাধিক ভোট ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোটারদের দেয়া ভোটের শতকরা ২৫ ভাগ লাভ করবেন তাকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হবে। এ শর্তগুলো যদি কোন প্রার্থীই পূরণ করতে না পারেন তাহলে মোট যত ভোট গৃহীত হবে তার মধ্যে যিনি সর্বাধিক ভোট পাবেন তিনি নির্বাচিত হবেন।

যখন তফশিলিরা অখণ্ড বাংলার পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন দান করলেন তখন মুসলিম লীগ আভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়লো। ২৮ মে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব নেয়া হয় যে, বাংলার শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসু যে প্রস্তাব করেছেন, তার সাথে মুসলিম লীগের কোনো সম্পর্ক নেই। কমিটি আরো সিদ্ধান্ত নেয় যে, ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রশ্নে আলোচনা করার অধিকারী একমাত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর। বাংলার মুসলমানেরা তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। সভা প্রাদেশিক লীগের সাব কমিটি ভেঙ্গে দেয়। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম এ সভায় অনুপস্থিত ছিলেন।

এরপর ১৯৪৭ সালের ২৮ মে তারিখে প্রদত্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকের এক বিবৃতি অবিভক্ত বাংলার ফর্মুলাকে আরও এক দফা বিপর্যস্ত করে। ভারতীয় কংগ্রেসের পথ ধরে বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক কালীপদ মুখার্জি এ পরিকল্পনা প্রত্যাখান করে ১৯৪৭ সালের ১ জুন এক বিবৃতি প্রদান করেন।

স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হক সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও নেতারা তাঁর সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন। ১৯৪৭ সালের ২৯ মে তার কৃষক প্রজাপার্টির প্রায় ৪০০ সদস্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদ ও ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। তারা

www.pathagar.com

বলেন, মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের দাবিগুলো হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধাবে এবং ভবিষ্যৎ ভয়ংকর হবে। তারা পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করে বলেন মুসলিম লীগ পোকায় খাওয়া ও পঙ্গু পাকিস্তান পাবে। তারা মনে করেন ন্যায় ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠন দেশের সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে পারে। এ রূপে রাষ্ট্র রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখতে হবে। পরিশেষে তারা বাংলা ও আসাম প্রদেশ নিয়ে স্বাধীন বঙ্গ প্রতিষ্ঠার দাবী জানান।

১৯৪৭ সালের ৩১ মে নয়াদিল্লীতে এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে শ্রী শরৎবসু বলেন যে, স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংগে আলোচনা করেছেন। শ্রী বসু আশা প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যদি তাঁর পরিকল্পনা মেনে নেন, তাহলে কার্যতঃ তাঁর পরিকল্পনার অনুরূপ সোহরাওয়ার্দী পরিকল্পনা স্বীকার করে নিতে লীগ হাই কমাণ্ডকে রাজী করানো সম্ভব হবে।

শ্রী বসু বলেনঃ আমার পরিকল্পনায় আমার আস্থা আছে এবং শেষ পর্যন্ত আমি এতে অনড় থাকবো। আমি অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে দেখা করবো। এবং বাংলা বিভাগের সম্ভাবনা রোধ করার সকল উপায় চেষ্টা করে দেখবো। আমার বক্তব্য কেবলমাত্র স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রই ভারতের অবশিষ্টাংশের সংগে তার সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

এদিন (১ জুন) বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে 'মর্নিং নিউজ'-এ 'সার্বভৌম বাঙলার জীবন চরিত ও মৃত্যু কাহিনী' শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখা হয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, যার জন্ম হয়েছিল দিল্লীতে এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীর সাংবাদিক সম্মেলনে, পাকিস্তানের জাতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন সেই সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র নামের শিশুটি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে ২৮ মে যখন লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সোহরাওয়ার্দী-বসু ফর্মূলা নিন্দার সাথে প্রত্যাখ্যান করে।

১ জুন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বাংলা থেকে মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন এবং এম.এ. ইস্পাহানি উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে কোনো আলোচনা হয় নি।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ২ জুন দিল্লীতে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় "বিগ সেভেন" নামে অভিহিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনী, বলদেব সিংহ, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, আবদুর রব নিশতার উপস্থিত ছিলেন। লর্ড ইজমে এবং স্যার এরিফ মায়াভিলও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই বৈঠকটি

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হয়। একজন ভারতীয় ক্যামেরাম্যান ছাড়া আর কারো এখানে ঢোকার অনুমতি ছিল না। এই বৈঠকে কোন সাংবাদিক প্রবেশের অনুমতি না দেয়ায় ভাইসরয় ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন। এই বৈঠকে মাউন্টব্যাটেন আগাগোড়াই পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখেন। বৈঠকে ভিপি মেনন রচিত ও বৃটিশ সরকার অনুমোদিত ৩রা জুনের পরিকল্পনা হিন্দু মুসলিম ও শিখ নেতাদের নিকট পেশ করা হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা বা আলোচনার কোন সুযোগ দেয়া হয়নি। এ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাইসরয়ের বক্তব্য ছিল, হয় একে গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে। তবে লীগ এ পরিকল্পনা বর্জন করলে তাদের পরিণতি শুভ হবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের হাতেই সকল ক্ষমতা হস্তান্তর করবে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। এ বৈঠকেই ৩ জুনের পরিকল্পনা বা দেশভাগের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলা ও পাঞ্জাবকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে মি. জিন্নাহ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে রীতিমত তর্ক-বিতর্ক করেন। মাউন্টব্যাটেন নিজেই বলেছেন ঃ While Jinnah who demanded the partition of India, would not agree to the principle of partition of provinces. (মেনন, ৩৭২) অর্থাৎ জিন্নাহ সাহেব তখনও প্রদেশ বা বাংলা ভাগ নীতিগতভাবে স্বীকার করেননি।

'Mountbatten: the partition of India' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মাউন্টব্যাটেনকে জিন্নাহ বলেনঃ আপনারা আমাদেরকে টিকে থাকার মতো একটি পাকিস্তান দিন। আমাদেরকে অবশ্যই সমগ্র পাঞ্জাব, সমগ্র বাংলা ও আসাম দিতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য আমরা একটা করিডোর চাই'। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে বলেন, 'আপনারাই তো বলছেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যালঘুদের উপর শাসন আপনারা মেনে নেবেন না। তাই পাকিস্তান যদি আপনাদের কাম্যই হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করতে হবে'। এর উত্তরে জিন্নাহ বললেন, মহামান্য বড়লাট, আপনি বুঝতে চাইছেন না কেন যে, পাঞ্জাবীরা একটি জাতি, বাঙালিরা একটি জাতি। একজন লোক হিন্দু না মুসলিম তার আগে তার প্রথম পরিচয় সে পাঞ্জাবী অথবা বাঙালি'।

তবে আপোষ ফর্মূলারূপে বৃটিশের ৩ জুনের পরিকল্পনায় অন্য সকল পক্ষের মত জিন্নাহও সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, ঘটনা প্রবাহের সেই পর্যায়ে কারও পক্ষেই অন্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব ছিল না।

এখানে উল্লেখ যে, বড়লাটের রিফর্ম কমিশনার ও প্রধান উপদেষ্টা ভিপি মেনন এই পরিকল্পনাটি রচনা করেন। মাউন্টব্যাটেন ১১ মে নেহেরুকে এটা দেখতে দেন। নেহেরু অনুমোদন করলে ১৮ মে বড়লাট এ খসড়া নিয়ে লন্ডন যান। এটলী

www.pathagar.com

সরকারের অনুমোদন নিয়ে ৩১ মে বড়লাট এই নতুন পরিকল্পনাসহ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৩ জুন এ পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।এই পরিকল্পনার মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

(ক) এই উপমহাদেশে দুটি ডোমিনিয়ন-ভারত প্রজাতন্ত্র ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে।

(খ) ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান বাসিন্দার প্রেক্ষিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলির পরিষদ সদস্যরা আলাদা ভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন।

(গ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

৩ জুন অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন, পণ্ডিত নেহেরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভাষণ দেন। বেতারে মাউন্টব্যাটেন প্রথমে তার ভারত ভাগ করার খসড়া প্রস্তাব ঘোষণা করেন। নেহেরু বললেন, যদিও এ প্রস্তাব আমি আপনাদের গ্রহণ করতে বলছি, কিন্তু আমার হৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হচ্ছে।

জিন্নাহর ভাষণটি ছিল খুব সংক্ষিপ্ত। এবং ভাবাবেগ বর্জিত। তিনি বলেন, বৃটিশ সরকারের এই পরিকল্পনাটিকে আমাদের আপোষ পরিকল্পনা হিসেবে গ্রহণ করবো, না সমাধান হিসেবে, সেটা আমাদেরকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

ঐদিন সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে নিয়ে মিসৌরিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। জিন্নাহ তাদেরকে কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ বাংলা সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দেন।

১৯৪৭ সালের ৮ই জুন নয়াদিল্লীতে মুসলিম লীগের ৩ দিন ব্যাপি কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়েছিল।

৮ই জুন সভার শুরুতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পাঞ্জাবের খাকসারগণ বেলচা নিয়ে সভাস্থলে আক্রমণ চালায়। লীগের সেচ্ছাসেবকগণের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। হোটেলের মেঝে খাকসারদের রক্তে রঞ্জিত হয়।

৯ জুন অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় জিন্নাহকে বঙ্গ ভঙ্গ গ্রহণ না করার পরামর্শ দেয়া হয়।

১০ই জুন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের তৃতীয় ও চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয় ৩ জুনের ঘোষণা সমর্থন করে। জিন্নাহ তাঁর জীবদ্দশায় পাকিস্তান দেখতে চান। এই কথা বলেই তিনি কাউন্সিলারদের প্রতি বৃটিশ

www.pathagar.com

প্রস্তাব মেনে নেবার আহ্বান জানান। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে ভোট গ্রহণের আগে অবশ্য প্রস্তাবের ভালমন্দ দুটি দিকই তুলে ধরেছিলেন। কতটা লাভবান এবং কতটা ক্ষতি স্বীকার করতে হবে তাও তিনি বলেন। তিনি জানান সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে কাউন্সিলারদের উপর। এ বিষয় মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়নি যা কাউন্সিলারদের প্রভাবিত করতে পারে। হেডিং সহ আজাদ-এর প্রতিবেদন (আজাদ, জুন ১২, ১৯৪৭ বৃহস্পতিবার) ঃ

বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই ঃ

নয়দিল্লী, ১০ই জুন। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের দুইটি অধিবেশনের পর মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কাউন্সিল সদস্যগণ কায়েদে আজমকে সুস্পষ্টরূপে জানান যে, তাহারা বাংলা বা পাঞ্জাব বিভাগ মানিয়া লইতেছে না। তাহারা এই প্রস্তাব দুই কারণে মানিয়া লইয়াছেন– প্রথমতঃ মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাব গ্রহণ অথবা বর্জন, তাহাদের নিকট এই দুইটি মাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি উত্থাপন করা হইয়াছিল বলিয়াও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

কাউন্সিলের ৪০০ জন সদস্য পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। কিন্তু ১১ জন সদস্য ভোট দেন এর বিপক্ষে। তাদের ৮ জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। মাওলানা নুসরৎ মোহানী (যুক্ত প্রদেশ)
২। আবুল হাশিম (বর্ধমান)
৩। আলী হাশেম (বর্ধমান)
৪। প্রফেসর আব্দুর রহমান
৫। জহীর হুসেন লারী (যুক্ত প্রদেশ)
৬। আলমাস (ঢাকা)
৭। শামসুল হক (ঢাকা)
৮। শাসসুদ্দিন (ঢাকা)

জিন্নাহ যখন চূড়ান্তভাবে বললেন আমাদেরকে বৃটিশ প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে (পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগসহ) মেনে নিতে হবে অথবা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করতে হবে। হাত তুলে ভোট দেবার আহ্বান জানালেন তিনি। সোহরাওয়ার্দী হাত গুনে রায় দিলেন বৃটিশ প্রস্তাবের পক্ষেই সকল হাত এবং মাত্র ১১টি হাত বিপক্ষে।

এভাবে ১৯৪০ সালের বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাবকে অনাড়ম্বরভাবে আরব সাগরে নিক্ষেপ করা হলো এবং জিন্নাহ একসময় যাকে কীটদুষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছিলেন

www.pathagar.com

সেই পাকিস্তানকে দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে নিলেন।

৮ জুন গান্ধী শরৎচন্দ্র বসুকে লেখেন, "তোমার খসড়া পড়লাম। আমি এখন পরিকল্পনাটি নিয়ে মোটামুটিভাবে পণ্ডিত নেহরু এবং সরদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দু'জনেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে অনড় এবং তাঁরা মনে করেন এটা কেবল তফসিলি সম্প্রদায়ের এবং হিন্দু নেতাদের দ্বিধাবিভক্ত করার ফন্দী।" পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও প্যাটেল অভিযোগ করেন যে, যুক্ত বাঙলার পক্ষে তফসিলিদের ভোট সংগ্রহের জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। গান্ধী তাঁকে অবহিত করেন যে, ভারতের দু'অংশের বাইরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই গান্ধী শরৎ বসুকে বাংলার অখণ্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করতে বলেন। গান্ধীজীর এই আকস্মিক মত পরিবর্তনে শরৎ বসু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তিনি বলেন, 'ভারত বিভাগ একটি পাপ কিন্তু বাংলা মায়ের দ্বিখন্ডিকরণ আরও মহাপাপ।'

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ৯ই জুন শরৎচন্দ্র বসু জিন্নাকে এক চিঠি লিখলেন ঃ

প্রিয় জিন্নাহ,

আমার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য আপনাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলা তার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এখনও তাকে রক্ষা করা যায়। তাকে রক্ষা করা চলে যদি বঙ্গীয় আইন পরিষদের মুসলমান সদস্যদেরকে অনুগ্রহ করে আপনি নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করেন ঃ

(১) আইন সভার সদস্যদের (ইউরোপিয়ান বাদে) অনুষ্ঠিতব্য সভায় যেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে সমগ্র প্রদেশের কোন বিধান সভায় তারা যোগ দেবেন পরবর্তীকালে, যদি উভয় অংশ একত্রিত থাকবেন বলে স্থির করেন তাহলে তাঁরা যেন হিন্দুস্থান অথবা পাকিস্তান কোন বিধান সভার পক্ষে ভোট না দেন এবং বিধান সভায় অথবা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অথবা অন্যভাবে পরিস্কারভাবে তারা বলেন যে, তাঁরা দৃঢ়ভাবে বাংলার নিজস্ব বিধান সভার সপক্ষে।

(২) উভয় অংশের আইন সভার সদস্যদের পৃথক বৈঠকে প্রদেশকে বিভক্ত করা হবে কিনা সে বিষয়ে ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করা।

আমাদের সাক্ষাতে আপনি যে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন সে অনুযায়ী আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনার সদস্যদের কিভাবে ভোট প্রদান করতে হবে সে বিষয়ে যদি সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশ না দিয়ে শুধুমাত্র আপনার মতামত ব্যক্ত করেন তাহলে এ অবস্থাকে রক্ষা করা যাবে না। আমি আশা করি বাংলার অখন্ডতা বজায় রাখতে এবং তাকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে আপনি আপনার ক্ষমতাকে কাজে লাগাবেন।

অনুচ্ছেদ এক ও দুই-এ যে প্রস্তাব করা হয়েছে সেভাবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্যরা যদি সঠিকভাবে ভোট প্রদান করেন, আমার মনে হয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ইউরোপিয়ান সদস্য বাদে সংসদের সকল সদস্যের আরেকটি সভা আহ্বান করতে বাধ্য হবেন যেখানে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে যে সারা প্রদেশ তাদের নিজেদের পৃথক বিধান পরিষদ চান কিনা।

আমি তের অথবা চৌদ্দ তারিখে দিল্লী পৌঁছাব এবং আপনার সাথে চৌদ্দ অথবা পনের তারিখে দেখা করবো।

কায়েদে আজম এম. এ. জিন্নাহ
ব্যারিস্টার-এট-ল
১৫নং আওরঙ্গজেব রোড, নতুন দিল্লী।

শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানিয়ে
আপনার একান্ত
শরৎচন্দ্র বসু (স্বাক্ষরিত)

www.pathagar.com

কিন্তু ইতোমধ্যে ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রথম সারির ব্যক্তিদের অখন্ড ও স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার বিরোধিতার কথা জিন্নাহ সাহেব জেনে গেছেন, তাই অনিবার্য কারণেই জিন্নাহ সাহেবের সংগে শরৎ বসুর আলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় বলেন, শরৎ বাবুর অখন্ড ও স্বাধীন বাংলার প্রচেষ্টায় সমর্থন দেয়ার জন্য তাকে অনেক শাস্তি পেতে হয়েছে [Was taken to task]

এ সময়ে দেশ বিভাগ ও বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার বিরুদ্ধে সৈয়দ বদরুদ্দোজা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ১৯৪১ সালের ১০ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ থেকে তার স্বেচ্ছা নির্বাসনের পর সৈয়দ বদরুদ্দোজার জনপ্রিয়তা চলছে তখন ভাটা, বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তখন তার প্রভাব নেই বললেই চলে। তবু তার সেই চরম দুর্দিনেও বাংলা ও ভারতের সংখ্যালঘুদের স্বার্থে সৈয়দ বদরুদ্দোজা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন ভারত ও বাংলা বিভাগ রুখতে। এ সময়ে তিনি জনসভা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম এবং বাংলার বিধানসভা ও বিধান পরিষদে বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দীর সংগে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও শরৎ বসুর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য তাকে সুযোগ দিয়েছিল সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বসুর স্বাধীন, সার্বভৌমত্ব অখন্ড বাংলার পরিকল্পনাকে সাহায্য করতে এবং তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে শরৎ বসুকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বাংলার বিভক্তি রোধ করার জন্য এক আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন। এ পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনি কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেসের নেতা, আল্লার ওয়াস্তে আপনি দেশ বিভাগে রাজি হবেন না। সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজ, রাজনীতি ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে বাংলা অবিভাজ্য। সেই বাংলার স্বার্থে আপনি এ প্রদেশকে বিভক্ত হতে বাঁচান। সাত থেকে আট কোটি মানুষের এ আবাসস্থল, ভারতের একটি সুদৃঢ় ব্লক হিসেবে বাংলা থাকবে। আমার হিন্দু ভাই-বোনেরা বাংলার বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৪৯ ভাগ। তাই বাংলার মুসলমানরা শতকরা ৫১ ভাগ হলেও তাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) ভয় করার কোনো কারণ নেই। কারণ, শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি এবং সবদিক দিয়ে তারা (অর্থাৎ হিন্দুরা) বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ।

১৪ জুন শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীকে পত্র লিখে জানান যে, জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের অভিযোগ বা সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বৃহত্তর বাংলা গঠন একটি চক্রান্ত–এ অভিযোগ শরৎচন্দ্র বসু অস্বীকার করে বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাংলার অখণ্ডতার জন্য কাজ করে যাবার অভিপ্রায় পোষণ

www.pathagar.com

করি। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে যে প্রচন্ড উত্তেজনামূলক প্রচারাভিযান চলছে এদতসত্ত্বেও এব্যাপারে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। যদি গণভোট দেয়া হতো তাহলে বাংলার হিন্দুরা বংগভঙ্গের বিপক্ষে অধিক সংখ্যায় ভোট প্রদান করতেন। বাঙলার কণ্ঠকে কিছু কালের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে সে নিজেকে জোরের সঙ্গে প্রকাশ করবে।" তিনি কংগ্রেস নেতাদের বাংলা-বিরোধী কার্যাবলী দেখে কংগ্রেসকে হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিযুক্ত করেন।

সর্দার প্যাটেল, জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে মওলানা আজাদের দেয়া তথ্য বিশ্লেষণ করলে পরিস্কার বোঝা যায় যে, ৩ জুন, ১৯৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার অনেক আগে এপ্রিলের শুরুতেই কংগ্রেসের এই তিন মহামানব ভারত বিভাগের পরিকল্পনাকে মেনে নিয়েছিলেন। এই তিনজনের প্রভাবেই ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি ৩ জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি [AI.C.C] সহজে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব মেনে নেয়নি।

আবুল কালাম আজাদ

এ. আই. সি. সির প্রথম দিনের অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেশ উস্মা দেখা যায়। সর্দার প্যাটেল ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থের চেষ্টায়ও AICC সদস্যদের দ্বারা ৩ জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এবার গান্ধীজী মাঠে নামলেন। ভারত বিভাগের দাবী তাঁর লাশের ওপর দিয়ে কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হলোনা। সশরীরে সজ্ঞানে এবং জীবন্ত অবস্থায় গান্ধীজী এ.আই.সি.সির সদস্যদের অনুরোধ করলেন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে। মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে অবশেষে এ.আই.সি.সি ভারতকে বিভক্ত করতে রাজি হলো।

যে নিখিল ভারত কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেছিল তারা সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগে সম্মত হলো। মওলানা আজাদ আরো লিখেছেন, সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সদস্যদের দলে টানার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো হলো।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার বিরোধী হিন্দু সদস্যদের বোঝানো হলো যে, পাকিস্তানে যদি হিন্দুরা অসুবিধায় পড়ে অথবা অসম্মান বোধ করে তাহলে ভারত এর

www.pathagar.com

জন্য তার মুসলিম নাগরিকদের ওপর প্রতিশোধ নেবে। খোলাখুলিভাবে আরো বলা হলো যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, কারণ তাদের ওপর যদি অত্যাচার হয় তাহলে ভারতের সাড়ে চার কোটি মুসলমানদের ওপর তার প্রতিক্রিয়া হবে। (India Wins Freedom by Maulana Abul kalam Azad)

এতো প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার ও মিথ্যা প্রচারণা সত্ত্বেও যখন ভারত বিভাগের প্রস্তাব এ আই সি সি সদস্যদের কাছে ভোটে দেয়া হলো তখনো এ প্রস্তাব মেনে নেয়ার জন্য গান্ধীজীর অনুরোধ এ.আই. সি.সি সদস্যরা সর্বসম্মতি ক্রমে মেনে নেননি এবং এ.আই.সি.সির ১৫ জন সদস্য ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। এর ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ জুন ২৯ ভোটের সমর্থনে এবং ১৫ ভোটের বিরোধিতায় এ.আই.সি.সির মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালের ১১ জুন বাংলার গভর্নর এক ঘোষণায় বাংলা বিভাগ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২০ জুন বাংলার আইন সভার সদস্যদের এক বৈঠক আহ্বান করেন। ১২ জুন খাজা-পন্থী কয়েকজন মুসলিম লীগ নেতা দিল্লী থেকে কলকাতায় আগমন করেন। তাদের বরাত দিয়ে 'মর্নিং নিউজ' জানায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হবে ঢাকা। পত্রিকাটি আরো আভাস দেয় যে, নতুন সরকারের কর্ণধার হিসেবে খাজা নাজিমুদ্দিনের নাম শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এটা ছিল বাংলার রাজনীতি থেকে সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমের বিদায়ের অশুভ সঙ্কেতস্বরূপ। এ সময় মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাশিম ছুটিতে ছিলেন এবং তাঁর জায়গায় হাবিবুল্লাহ বাহার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

অতঃপর ২০ জুন বাংলাকে ভাগ করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু হয় ৩ জুনের পরিকল্পনা মোতাবেক। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগ দলীয় ব্যবস্থাপক সদস্যদের নিকট এই মর্মে নির্দেশ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে ভোট প্রদান করেন। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডও বাংলার সকল হিন্দু পরিষদ সদস্যদের নিকট এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন বাংলা বিভাগের পক্ষে ভোট দান করেন।

বৃটিশ সরকারের ৩ জুনের ঘোষণার ভিত্তিতে ২০ জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদের বিধায়কদের এক যুক্ত অধিবেশন বিকেল ৩টায় স্পিকার নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে দুটি গণপরিষদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটি হয়। পরিষদের ১২৬ জন সদস্য প্রস্তাবিত পাকিস্তান গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। ১২৬ জনের মধ্যে ১২০ জন ছিলেন মুসলিম লীগ সদস্য, ৫জন ছিলেন তফসিলী ফেডারেশনের সদস্য এবং ১ জন ছিলেন ভারতীয় খ্রীস্টান।

www.pathagar.com

অপরদিকে ৯০ জন সদস্য ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন। ঐ ৯০ জনের মধ্যে ৮২ জন ছিলেন কংগ্রেস সদস্য, ৪ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মাহতাব।

অধিবেশনে এ. কে. ফজলুল হক অনুপস্থিত ছিলেন। তিনজন কমুনিষ্ট সদস্য জ্যোতি বসু, রতন লাল ব্রাহ্মণ এবং রূপনারায়ণ ভোট প্রদানে বিরত থাকেন। মিঃ তোফাজ্জল আলী বিলম্বে আসায় ভোট দান করতে পারেন নি।

বঙ্গীয় আইন পরিষদের যে অংশ বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে, সে অংশের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার নূরুল আমিন। পরিষদ পূর্ব বাংলার বিধায়কগণের ১০৬-৩৫ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে বাংলা বিভাগ করা চলবে না। বাংলাদেশকে ভাগ করার পক্ষে পূর্ব বাংলার যে ৩৫ জন সদস্য (বিধায়ক) ভোট দিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে কেউ বাংলা-বিভক্তির পক্ষে ভোট দেন নি। তবে ৪ জন হিন্দু বাঙালি ও একজন খ্রিষ্টান বাঙালি অখন্ড বাংলাদেশের পক্ষ ভোট দেন।

বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মাহতাব–এর সভাপতিত্বে অমুসলিম সংখ্যাগুরু (পশ্চিম বাংলা) অংশ ৫৮–২১ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, বাংলা বিভাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যে ৫৮ জন বাংলদেশ ভাগ করার পক্ষে ভোট দেন তাদের ৪৮ জন কংগ্রেস সদস্য, চারজন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, একজন ভারতীয় খৃষ্টান, দুজন কমুনিষ্ট সদস্য, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মাহতাব। বাংলাদেশকে ভাগ না করার পক্ষে ভোট দেন ২১ জন। এদের সবাই মুসলিম বাঙালি। এভাবে তৎকালীন মুসলিম লীগের মতের বিরুদ্ধে স্রেফ সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মতের ভিত্তিতেই বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। ফলে বৃটিশ ও কংগ্রেস-এর কারসাজিতে স্বাধীন বাংলা গঠনের উদ্যোগ বাতিল হয়ে যায়।

হিন্দু নেতৃবৃন্দ, একদিন যারা বংগ-ভঙ্গকে 'মায়ের ব্যবচ্ছেদ' বলে বলেছিলেন, তারাই ১৯৪৭ সালে অখন্ড বাংলাকে সমর্থন করেন নি। এর কারণ, তারা দেখছিলেন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাকে সমর্থন করে তাদের লাভ নেই। বরং খন্ডিত বাংলা নিয়ে ভারতের সংগে থাকাই তারা যুক্তিসংগত মনে করেছিলেন। এ কারণেই জ্যোতি বসুর মত বামপন্থী নেতাও বাংলাদেশকে ভাগ করার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।

শরৎ বাবু তাঁর সাপ্তাহিক জাগরণ পত্রিকায় লিখলেন– 'প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে

www.pathagar.com

কেউ কেউ হয়তো ভেবেছেন, বিভক্ত বাংলার হিন্দু বাঙালি হয়তো স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে। কিন্তু এ স্বপ্ন মরীচিকা মাত্র। তিনি আরো লিখেছেন, আইন পরিষদের হিন্দু-সদস্যদের ও বাংলা কংগ্রেসের স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার দিলে তাদের অধিকাংশ বাংলা বিভাগের রোয়েদাদ প্রত্যাখ্যান করতেন। ..... বাঙালি হিন্দুর বুকের উপর হুকুম নামার পিস্তল ধরে মৃত্যু পরোয়ানা সই করে নেয়া হচ্ছে অথচ হিন্দু-বাংলা টু-শব্দটি করতে পারছে না। সুরেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও নেতাজীর জাতির কি সত্যিই এমনি অধঃপতন হয়েছে।

আবুল হাসিমও বেদনার সুরে মন্তব্য করেছেন, 'যাদের মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যয়, চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু-র মতো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, সেই বাংলার হিন্দুদের হল কি।' (আবুল হাসেমের ২৮ এপ্রিলের ১৯৪৭ ভাষণ থেকে)

যারা অখন্ড বাংলাদেশকে সমর্থন করেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অভিন্ন ছিল না। নূরুল আমিন, মওলানা আকরম খাঁ, খাজা নাজিমুদ্দিন ও হামিদুল হক চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অখন্ড বাংলাকে সমর্থন জানিয়েছেন পুরো অঞ্চলটিকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু ও ড. কিরণ শঙ্কর রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য অখন্ড বাংলা চেয়েছেন।

মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাগুলির অংশ ১০৫–৩৬ ভোটে সিলেট জেলা পাকিস্তানভুক্তি কামনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভোটের ফলাফল দেখলেই বোঝা যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের নামে কি প্রবঞ্চনা আর প্রহসনের অভিনয় করা হয়েছে। বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর সেদিনই প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানান সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আশা-নিরাশার যন্ত্রণার ইতি হলো অবশেষে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের আদর্শের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে অচিরেই, মুসলিম বাংলার ক্ষোভের বিশেষ কারণ নেই। আমরা অবশ্যই চেয়েছিলাম একটা সুষম ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র, যেখানে আমরা স্বনির্ভর হয়ে আমাদের সম্পদকে সদ্ব্যবহার করে বিশ্বের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল সমৃদ্ধশালী জাতি গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্ত সেই লক্ষ্যের পথে যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ..... আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেছে। চলুন আমরা পরস্পরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব বজায় রেখেই পৃথক পথে এগিয়ে যাই এবং প্রতিহিংসার মনোভাব পোষণ ও প্রতিপক্ষকে পদানত করে কৃপা ভিক্ষায় বাধ্য করার হুমকি প্রদর্শন থেকে বিরত হই।"

www.pathagar.com

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ২১ জুন মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সভাপতিত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি, নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে সম্পদ কমিটি, মওলানা আকরম খাঁর সভাপতিত্বে সিলেট গণভোট কমিটি গঠন করা হয়। সোহরাওয়ার্দীকে একমাত্র সীমানা নির্ধারণ কমিটির সদস্য করা হয়। মুসলিম লীগ তাঁকে বাংলার নেতৃত্ব থেকে অন্যায়ভাবে অপসারণ করতে থাকে।

৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা কলকাতা ত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের যুক্তিছিল, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জন সাধারণ বঙ্গ বিভাগ চাইনি, সেহেতু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাংলার রাজধানীর উপর দাবি করতে পারেনা। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তদনীন্তন মন্ত্রী মুহাম্মদ আলী (বগুড়া) একটি বিবৃতিও প্রচার করেন। এই বিবৃতিতে বলা হয় যে, কলকাতা পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং কলকাতা মহানগরীর নির্মাণে ও উন্নয়নে পূর্ববঙ্গের শতকরা ৭৫ ভাগ অবদান রয়েছে, কলকাতার উপর পূর্ববঙ্গের দাবি বেশি এবং অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাই অন্ততঃ কলকাতা বাবদ উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত কলকাতা ত্যাগ করা হবে না। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসলিম লীগে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা, অন্যথায় কলকাতার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ আদায়ের সংগ্রাম যখন গতিশীল হয়ে উঠেছে সেই সময় হঠাৎ ২৭ জুন প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় মাত্র ৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের অস্থায়ী সদর দফতর স্থাপিত হবে।

মুহাম্মদ আলী (বগুড়া)

চূড়ান্ত ফয়সালা হবার আগেই কলকাতার ওপর দাবি শিথিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় সোহরাওয়ার্দী তীব্র প্রতিবাদ জানান। সোহরাওয়ার্দীর ইচ্ছা ছিল কলকাতা হবে পূর্ব বাংলার রাজধানী। তিনি 'কোলকাতা রাখো' আন্দোলন শুরু করেন। এ. কে. ফজলুল হকও 'কোলকাতা রাখো' আন্দোলন সমর্থন করেন। বাংলার অর্থ, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থ দিয়েই কলকাতা শহরের উন্নতি। গভর্নর বারোজ কলকাতাকে পূর্ববঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। তিনি ভাইসরয়কে লিখে জানান 'প্রধানত ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসার স্বার্থকে কেন্দ্র করে এ শহর গড়ে উঠেছে এবং এর অবস্থান উভয়-পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার ওপর নির্ভরশীল। এ শহরকে ধ্বংস হতে দেয়া যায় না।

www.pathagar.com

যদি এ প্রদেশ বিভক্ত হয়ে যায় তবে সম্ভব হলে এ শহরকে সুযোগ দিতে হবে।' কিন্তু মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হননি। খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপ ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুসলিম লীগ 'কোলকাতা রাখো' আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করে। হিন্দু-মারওয়ারী ব্যবসায়ীগণ কলকাতা ছাড়তে নারাজ। অন্যদিকে অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ কলকাতার পরিবর্তে ঢাকাকে রাজধানী করায় আগ্রহী ছিলেন বেশি। তাদের মধ্যে ছিলেন আদমজী, দাউদ ও ইস্পাহানি। তাদের ধারণা যে, অবাঙালি ব্যবসায়ীগণ পূর্ব বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারবেন। হিন্দু নেতাদের বিরোধিতার জন্যেই সোহরাওয়ার্দীর 'কোলকাতা রাখো' আন্দোলনও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি দাবি করেন, কমপক্ষে ৬ মাস কলকাতাকে যৌথ প্রশাসনে রাখা হোক। কিন্তু এ প্রস্তাবের উত্তরে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল বলেছিলেন, 'দুদিনের জন্যও নয়।'

বাংলার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ৩০ জুলাই মাউন্টব্যাটেন কলকাতায় আগমন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্বাধীন বাংলা গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্টব্যাটেনের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন। স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেনকে রাজি করানোর জন্য তিনি শেষ প্রচেষ্টা চালালে ভাইসরয় তাঁর পরিকল্পনা নাচক করে দেন।

১৯০৫ সালে পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় বিষয়টিকে বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ বলে মনে করেছে এবং তার বিরুদ্ধে দূর্বার আন্দোলন করে তা রদ করেছে। ১৯৪৭ সালে বাংলার সেই হিন্দু সম্প্রদায়ই বাংলাকে বিভক্ত করার দাবী জানিয়েছে এবং মূলতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবীতেই বাংলা বিভক্ত হয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে ১৯০৫ সালে বাঙালি হিন্দুরা অখন্ড বাংলার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করলেও ১৯৪৭ সালে মূলতঃ তাদের সিদ্ধান্তেই বাংলার বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে দুটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। বস্তুতঃ এর ফলে একটির স্থলে দুটি প্রদেশে বাঙালির কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছিল কিন্তু ১৯৪৭ এর বিভক্তির পর বিভক্ত বাঙালিরা দুটি পৃথক রাষ্টের অধীনে চলে যায় এবং দুটির একটিতেও তাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণ

১। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা বড় বিলম্বে পেশ করা হয়েছিল। তখন এর পিছনে কোন গণসমর্থন ছিল না।

২। ১৯৩৭-৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার প্রশাসনে মুসলমানের প্রতিপত্তি ছিল। পর পর তিন বার মুসলিম মন্ত্রীসভা বাংলা শাসন করায় কংগ্রেস ও হিন্দু সম্প্রদায় প্রশাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার ঐক্যের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

৩। দিল্লী প্রস্তাবই মূলত পরোক্ষভাবে বঙ্গ বিভাগের জন্ম দেয়। লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে এবং পূর্বপ্রান্তে দুটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। দিল্লী প্রস্তাবে দুটি রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে 'পাকিস্তান' নামে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ কারণেই এক হাজার মাইলের বেশি দূরত্বে অবস্থিত একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দা হওয়ার ব্যাপারে হিন্দু বাঙালিদের মধ্যে তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। তাদের ধারনা জন্মে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুস্থানের অন্তর্ভূক্ত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪। মুসলিম লীগ পাকিস্তান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করায় কলকাতা, নোয়াখালী ও বিহারে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। এই দাঙ্গায় বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। দাঙ্গার পর বাংলার হিন্দু সম্প্রদায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে বিরাট ফাটল ধরে। হিন্দু-মুসলমানের এক সাথে বসবাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে আশংকা জন্মে যে, নোয়াখালীর মত দাঙ্গা বোধ হয় প্রতিদিনই ঘটবে যুক্ত বাংলার প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি শহরে, প্রতিটি গ্রামে। ভুল আশংকার বশবর্তী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মত দিয়েছিল। তাদের মনে এই চিন্তা জাগ্রত হয় যে, বাংলা বিভক্ত হলে মুসলমানদের সাথে তাদের ক্ষমতার ভাগাভাগি করতে হবে না এবং পশ্চিমবঙ্গকে তারা নিজেরাই শাসন করার সুযোগ পাবে।

৫। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি বিভিন্ন কারণে হিন্দুদের আক্রোশ ছিল। সোহরাওয়ার্দী সাহেব জিন্নাহ সাহেবের অনুমতি নিয়েই ভারত বিভাগের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তখনই বাংলার সচেতন হিন্দুরা সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করে যে সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার কথা বলে সু-কৌশলে তাদেরকে পাকিস্তান নামক ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে চান। কারণ দিল্লী প্রস্তাবের সাথে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

প্রস্তাব মোটেও সংগতিশীল ছিল না। একই ব্যক্তি যিনি দিল্লী প্রস্তাবের উত্থাপক তিনি কি করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের প্রস্তাবক হতে পারেন। সোহরাওয়ার্দীর এই স্ববিরোধিতার জন্যই হিন্দু বাঙালিরা অবিভক্ত বাংলায় থাকার ব্যাপারে আগ্রহ হয়নি।

৬। স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার সংগঠকগণ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগকে তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করাতে না পারায় স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি।

৭। জনসংখ্যার বিভাজন স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। পশ্চিম বাংলায় হিন্দু ও পূর্ব বাংলায় মুসলিম জনবসতি বেশি থাকায় হিন্দুদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধের সৃষ্টি হয়। পশ্চিম বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গের ফলে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ কলকাতা ও খনিজ সম্পদ তাদের দখলে থাকবে।

৮। সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল। বিলম্বে পরিকল্পনা প্রকাশ করায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারে নি।

৯। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারতকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা ছিল। ১৯৪৭ সালের ২ জুনের মধ্যে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন বাংলার ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতি সংগ্রহ করতে বলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সম্মতি সংগ্রহ করতে পারেননি।

১০। কংগ্রেস হাই কমান্ড, বিশেষ করে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সব সময় অবিভক্ত বাংলার বিরোধী ছিলেন।

১১। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের হাই কমান্ড ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করায় স্বাধীন বাংলার আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

১২। ব্যর্থতার আর একটি কারণ প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ও বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির মধ্যে ঐকমত্য শূন্যতা। বাংলা বিভাগের ক্ষেত্রে সিলেটের মতো রেফারেন্ডাম দেয়া হয় নি। বাংলা বিভক্তির ওপর গণভোট দেয়া হলে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন সফল হতো। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার জন্য গণভোটের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি। অনেকে বলেন যে, বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার বিভক্তি রদ করা। কিন্তু তা সত্য নয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী লাহোর প্রস্তাব অনুসারে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবি করেছিলেন।

১৩। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলাদেশে তিন জন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ঃ শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দিন, এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী। অভিজাত হিন্দুরা মনে করেছে অবিভক্ত বাংলায় চিরদিন তাদের মুসলমানদের অধীনেই থাকতে হবে। একারণেই বাংলার পশ্চিম অংশ ভারতের সাথে যুক্ত হতে হবে।

www.pathagar.com

১৪। নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা বঙ্গভঙ্গের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে এবং বিশাল হিন্দুস্থানের সাথে যোগ দিতে মনস্থ করে।

১৫। ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস, বিশেষ করে পণ্ডিত নেহেরুর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী লেডি এডুইনার সাথে নেহরুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে কারণে নেহরু অতি সহজে এডুইনার মাধ্যমে ভাইসরয়কে প্রভাবিত করতে পারতেন। নেহরু বলতেন, তিনি কখনও স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন না এবং তার দেশের লোকদের এরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করতে দেবেন না। তাঁর মতে, বাংলা ভারতভুক্ত হওয়া ব্যতীত তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। ভারত বিভাগের প্রস্তাব নিয়ে লন্ডন গমন করার পূর্ব মুহূর্তে মাউন্টব্যাটেন চান নি যে সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন। এ প্রসঙ্গে গভর্ণর বারোজ বলেছেন, "ভাইসরয় চূড়ান্ত পরিকল্পনা নিয়ে ৩১ মে ফিরে আসেন। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে তাঁর সকল আশা চিরতরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

১৬। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ভারত ও বাঙলা বিভাগ মেনে নেয়ার ফলে স্বাধীন বাঙলার আন্দোলন থেমে যায়।

১৭। বর্ণহিন্দুরা তফশিলি সম্প্রদায়কে ঘৃণার চোখে দেখতো। এ কারণে তফশিলিরা মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং অলিখিত চুক্তিতেই তারা স্বাধীন সার্বভৌম অখন্ড বাংলার প্রতি শর্তহীন সমর্থন জানায়। তফশিলিদের আন্তরিক সমর্থন ও সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতি মুসলিম লীগ তেমন গুরুত্ব দেয়নি। শুধু তফশিলি ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন রাজপথ পর্যায়ে সঠিকভাবে পরিচালিত হলে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন ব্যর্থ হতো না।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হলে ভবিষ্যতে দু'বাংলা এক হতে পারে এ আশা নিয়ে ১৪ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, "যে সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলা বিভক্ত হচ্ছে তাতে কেউ খুশি হতে পারে না। সম্ভবত অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা পুনরায় দুই অংশকে একত্রিত করতে পারে।"

অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা বাঙালি মুসলিম নেতাদের বিশ্বাস করতে পারতেন না। লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান মন্তব্য করেছিলেন যে, "বাংলার মুসলিম এম.এল.এ-দের কোনো চরিত্র নেই। তাদের আদৌ বিশ্বাস করা যায় না। তারা কোনো কিছু পরিচালনা করতে পারবে না এবং সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্রি করে দেবে। এসকল বাঙালি এম.এল.এ-দের হিন্দুরা ক্রয় করবে এবং মুসলমানেরা পাকিস্তানের বিপক্ষে ভোট দিতে পারে।" লিয়াকত আলী কোনো সময়ই

www.pathagar.com

সোহরাওয়ার্দীর পত্রের উত্তর দেন নি। অবাঙালি মুসলিম লীগ নেতারা সব সময় বাংলার মুসলিম নেতাদের অবমূল্যায়ন করতেন। এ. কে. ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর, বাংলা তথা ভারতে মুসলমানদের উন্নয়নে এত অবদান থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেয়া হয় নি। অবাঙালি এসকল মুসলিম নেতার লেজুড়বৃত্তি করতো ঢাকার খাজা গ্রুপ। কেন্দ্রীয় লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ভূমিকা ছিল খুবই গৌণ। নিখিল ভারত মুসলিম লীগ বাংলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় নি। স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা আন্দোলন যত তুঙ্গে ওঠে, কেন্দ্রীয় লীগ নেতারা তার প্রতি ততই কম গুরুত্ব দিতে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করা হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটির ২৩ জন সদস্যের মধ্যে বাংলা থেকে মাত্র ৩ জন সদস্য ছিলেন। তাঁরা হলেন খাজা নাজিমুদ্দিন, মওলানা আকরম খাঁ এবং অবাঙালি ইস্পাহানি। এ.কে. ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে তাঁকেও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য করা হয় নি। অথচ ভারতের মোট মুসলমান জনসংখ্যার ১০ কোটির ৪ কোটি বাস করতো বাংলায়। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদ বাঙালিদের দেয়া হয় নি। ১৯৩৭ থেকে ৪৭ পর্যন্ত জিন্নাহ মুসলিম লীগের সভাপতি, লিয়াকত আলী খান সাধারণ সম্পাদক এবং মাহমুদাবাদের রাজা মোহাম্মদ আমির আহমেদ খান ট্রেজারার ছিলেন। একমাত্র যুগ্ম-সচিবের পদে নির্বাচনে দেয়া হতো। একবার মাত্র বাংলার খান বাহাদুর আবদুল মোমেন যুগ্ম-সচিব হন। কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সভা ১৯৩৬ থেকে ৪৭ সালের মধ্যে বাংলায় কোনো দিন অনুষ্ঠিত হয় নি। মুসলিম লীগে বাঙালি মুসলমানের এই করুণ অবস্থানের জন্য স্বাধীন বৃহত্তর বাংলার দাবির প্রতি কোনোদিন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। বরং এই আন্দোলনকে তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়।

গভর্নর বারোজ প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলার প্রতি সমর্থন দেন। বারোজ সোহরাওয়ার্দী-বসুর সাথে সহযাত্রী হিসেবেই কাজ করে গেছেন। তিনি বলতেন, পূর্বাঞ্চলের পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোনো ফলদায়ক ব্যাপার হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত কলকাতা ভবিষ্যতে ধ্বংস হবে। পূর্বাঞ্চলে শিল্প নেই; অঞ্চলটি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিভক্ত বাংলা বাঁচতে পারে না। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলার সমর্থক। মাউন্টব্যাটেন বৃহত্তর বাংলা সমর্থন করলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সমর্থন না করায় তিনি শেষ পর্যন্ত তার সমর্থন অব্যাহত রাখতে পারেন নি। তবে একথা ঠিক বৃটিশ সরকার দৃঢ় হলে স্বাধীন অবিভক্ত বাংলার আত্মপ্রকাশ ঘটতো।

কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ভেবেছিল বিভক্ত বাংলা বেশিদিন স্থায়ী হবে না। পূর্ব

www.pathagar.com

বাংলা কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের সাথে যোগ দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু তাদের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নি।

বৃহত্তর বাংলা আন্দোলন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই মুসলিম লীগ বিভক্ত হয়ে পড়ে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা ভিত্তিক মুসলিম লীগ আত্মপ্রকাশ করে। এছাড়া ছিল সার্বিকভাবে খাজা সমর্থক ও সোহরাওয়ার্দী সমর্থক দল। সোহরাওয়ার্দীর সাথে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের বিরোধ প্রকট হয়ে পড়ে। খাজা নাজিমুদ্দিনের দলের সাথে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। অন্যদিকে সোহরাওয়ার্দী গ্রুপ অবিভক্ত বাংলা, পূর্ণিয়া ও আসাম নিয়ে একত্রিত বা বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বৃহত্তর বাংলা আন্দোলনের ব্যর্থতার ফলে খাজা নাজিমুদ্দিন গ্রুপের জয় হয়। এই ভয়ঙ্কর পরাজয় একমাত্র সোহরাওয়ার্দীর দলের নয়, এ ছিল বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সার্বিক পরাজয়। পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের ভেতরেও সোহরাওয়ার্দী ও খাজা উপদল ছিল। সোহরাওয়ার্দীপন্থী মুসলিম লীগ থেকে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করে এবং স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলনের পথ ধরেই অবশেষে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

সোহরাওয়ার্দী স্বাধীন বাংলা ঘোষণার প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলার জনগণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলার সেই দাবির পিঠে ছুরিকাঘাত করে এবং তারা বাংলা ভাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্বাধীন বাংলার দাবি বাধ্য হয়ে অবেশেষে পরিত্যাগ করেন। তারপরও বাংলার সীমানা নির্ধারণ ও কলকাতা নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলার সীমানা নির্ধারণ ও বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে লিওনার্দ মোজলে তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, "বাংলা বিভাগের কাজটি সঙ্কটময় হলেও অসম্ভব ছিল না। বাঙলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ এবং মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব করেছিলেন। কিংবা তা না হলে অন্তত কলকাতাকে তাঁরা স্বাধীন নগরী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাইসরয় এবং শ্রমিক সরকার উভয়ই এই অজুহাত দেখিয়ে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, কংগ্রেস এটা কিছুতেই মেনে নেবে না।

www.pathagar.com

অখন্ড স্বাধীন বাংলা ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে সোহরাওয়ার্দী বৃহত্তর বাংলা গঠনের পরিকল্পনা শুরু করেন। এপ্রিল-মে মাসে তাঁর নেতৃত্বে বৃহত্তর বাংলা আন্দোলন উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দখল করে। এখন প্রশ্ন হলো শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবির পেছনে মুসলিম লীগের সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সমর্থন ছিল কি না। জিন্নাহর অনুগত হাসান ইস্পাহানি বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর সমর্থন পান নি। জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে এ পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন, কারণ তাহলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।হোসেন ইমাম বলেন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন জিন্নাহর অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে প্রথমে গান্ধী ও কংগ্রেসের সম্মতি নিতে বলেন। তারপরই তিনি তাতে সমর্থন দেবেন।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

বঙ্গীয় লীগ নেতা মওলানা রাগীব আহসান বলেন যে, জিন্নাহ সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন দিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী তাঁর স্মৃতিচারণে বলেন, "জিন্নাহর মত নিয়ে আমি এ পদক্ষেপ নিয়েছি।" সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালের ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডোমিনিয়ন মর্যাদায় স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবী করে বিবৃতি দেন। এর কয়েকদিন পূর্বে তিনি দিল্লী গমন করেন এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি জিন্নাহর সম্মতি নিয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় জিন্নাহর পরামর্শ মতই সোহরাওয়ার্দী দিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে স্বাধীন ও অখন্ড বাংলার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া রচিত 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশবছর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'বাংলা বিভাগের এবং কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন প্লান ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসেই লীগ নেতৃত্বের গোচরীভূত করা হয়। বাংলাদেশ এই প্রস্তাব মানিয়া নিতে অসম্মত হয়। বাংলাদেশের এই আপত্তির মুখে কায়েদে আজম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনার অনুমতি প্রদান করেন।'

২০ মে ১৯৪৭ তারিখে সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল

www.pathagar.com

হাশিমের মধ্যে যে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেটাও জিন্নাহর আশির্বাদ লাভ করে। সার্বভৌম বাংলা প্রস্তাবের প্রতি জিন্নাহর মনোভাব সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের লেখা থেকেও সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'এই পরিকল্পনার প্রতি কায়েদে আজমেরও আশির্বাদ ছিল।'

তৎকালীন আসাম উচ্চ পরিষদের সদস্য দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বলেন, তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নিকট স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা চুক্তি সম্পর্কে জিন্নাহর অভিমত জানতে চাইলে সোহরাওয়ার্দী তাঁকে জানান 'জিন্নাহ সাহেব তাঁকে ফেরৎ টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, যদি বাংলার মুসলমানদের সুবিধা হয় তবে স্বাধীন সার্বভৌম ও সমাজতান্ত্রিক বাংলা গ্রহণ করতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।'

তপন রায় চৌধুরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২ জুলাই ২০০৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'বাঙাল নামা' প্রবন্ধে বলেন, 'শরৎ বোস, সুরাবর্দি, কিরণ শঙ্কর এই তিনজন পরামর্শ করে সার্বভৌম বঙ্গের পরিকল্পনা করেন। জিন্নাহ সাহেব এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।'

লীগনেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রকাশ্যে কোনোসময় সোহরাওয়ার্দীকে স্বাধীন বাংলার দাবি পরিত্যাগ করতে বলেন নি। অধিকন্তু সোহরাওয়ার্দী সবসময় তাঁর দাবির অগ্রগতি সম্পর্কে জিন্নাহকে অবহিত করতেন। বঙ্গীয় মুসলিম লীগ প্রথমে তাঁর দাবিকে সমর্থন করে বিবৃতি দিয়েছে এবং কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেছে। মুসলিম লীগ ভেবেছিল স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা গঠিত হলে এক সময় তা পাকিস্তানে যোগ দেবে। জিন্নাহ নিজে বলতেন, কলকাতাকে বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলা চলতে পারে না। জিন্নাহ শরৎ-সোহরাওয়ার্দী ফর্মূলার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনো বিবৃতি দেন নি।

৩রা জুনের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে হডসনের 'The Greate Divide' গ্রন্থে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। এ বইয়ে হডসন বলেছেন, জিন্নাহ সাহেব বাংলা বিভাগ এড়ানোর জন্য হিন্দুদের অনেক ছাড় (Concession) দিতে রাজী ছিলেন। এমনকি বাংলাকে পাকিস্তানে না রাখার শর্তে বাংলাকে অখন্ড রাখতে চেয়েছিলেন। এতে যে তিনি খুশী হবেন তাও বিনাদ্বিধায় বলেছিলেন।

জিন্নাহ সাহেব আরো বলেছিলেন, কলকাতা ছাড়া বাংলার কি মূল্য আছে? তারা অর্থাৎ বাঙালিরা স্বাধীন ও অখন্ড থাকলেই বরং ভালো। আমি নিশ্চিত যে তারা পাকিস্তানের সংগে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। হডসন আরো বলেন, শুরুতে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলাকে একটি স্বাধীন ইউনিট হিসেবে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল কিন্তু জওহরলাল নেহেরু বাংলার এই অধিকারকে বাধা দিয়েছিলেন। তাই মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় বাংলার স্বাধীন ইউনিট হওয়ার অধিকারকে বাদ

www.pathagar.com

দেয়া হয়েছিল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার সংগে সংগে বাংলার মুসলিম লীগ শাখা এ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও বাংলা মুসলিম লীগ মাউন্টব্যাটেন পরিল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পর সোহরাওয়ার্দীকে স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে বলেন।

৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার দাবি জানান। এ দাবির সমর্থনে কলকাতার ইংরেজী দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকা এবং বাংলার হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর এক বিরাট অংশ এগিয়ে আসেন এবং তারা বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য জীবনপণ করেন।

একথা বললে ভুল হবে যে, কেবল ভারতীয় কংগ্রেসের হিন্দুনেতারা এবং কিছু বাঙালি নেতাই স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলার বিরোধীতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা বাস্তবায়নের সবচেয়ে বড় বাধা ছিলেন তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন। তিনি সাব্যস্ত করেছিলেন স্বাধীন, সার্বভৌম ও অখন্ড বাংলা মেনে নেয়ার পূর্বশর্ত ছিল ভারতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় মুসলিম লীগের এ ব্যাপারে পূর্ণ সমর্থন। ১৯৪৭ সালের ৬ অক্টোবর লন্ডনের রয়াল এমপায়ার সোসাইটিতে এক ভাষণে মাউন্টব্যাটেন তার এ ঘৃণ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেন। এ বক্তৃতায় তিনি বলেন, বাংলা ও পাঞ্জাবকে বিভক্তির বিরুদ্ধে জিন্নাহ সাহেব খুব জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ প্রদেশ দুটির জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে এবং এদের বিভক্তি হবে খুব সর্বনাশা। আমি তার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম এবং এ কথাও বলেছিলাম যে, আমি মনে করি ভারত বিভক্তির বিরুদ্ধে ঐ একই যুক্তি প্রয়োজন। জিন্নাহ সাহেব আমার কথা পছন্দ করেন নি এবং আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন, কেন ভারতকে বিভক্ত করতে হবে। অবশেষে জিন্নাহ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি অবিভক্ত বাংলা ও পাঞ্জাব চাইলে তাকে অবিভক্ত ভারতকে মেনে নিতে হবে অথবা তাকে মানতে হবে বিভক্ত ভারতের সংগে বিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত পাঞ্জাব। তিনি এ শেষোক্ত সমাধানটাই মেনে নিয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য যে, মাউন্টব্যাটেন ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির ব্যাপারে সর্দার বল্লবভাই প্যাটেলের যুক্তি হুবহু গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির পক্ষে ভারতীয় কংগ্রেস ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অনমনীয় মনোভাবই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে বাধ্য করেছিল বিভক্ত বাংলা ও বিভক্ত পাঞ্জাবকে নিয়ে কীটদুষ্ট ও পোকায় খাওয়া পাকিস্তানকে মেনে নিতে। এজন্যই ভারতীয় মুসলিম লীগ তার ১০ জুন ১৯৪৭ তারিখের কাউন্সিল মিটিংয়ে ভারত, বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভক্তি মেনে নেয়।

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে বাংলা বিভাগ

বাংলায় যেসব জেলা মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব জেলা পূর্ব পাকিস্তানে এবং যেসব জেলা হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের আদম শুমারীর রিপোর্ট অনুযায়ী গোটা বাংলাদেশের জেলা অনুপাতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো।

(যেসব জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী)

জেলার নাম	শতকরা কতজন মুসলমান	শতকরা কতজন হিন্দু
১। বগুড়া	৮৪	১৪.৮
২। নোয়াখালী	৮১.৪	১৮.৬
৩। ময়মনসিং	৭৭.৪	২১.৫
৪। ত্রিপুরা	৭৭.১	২২.৮
৫। চট্টগ্রাম	৭৪.৬	২১.৩
৬। রাজশাহী	৭৪.৬	২১
৭। বাখেরগঞ্জ (বরিশাল)	৭২.৩	২৭
৮। রংপুর	৭১.৪	২৭.৯
৯। ঢাকা	৬৭.৩	৩২.২
১০। পাবনা	৭৭.১	২২.৫
১১। ফরিদপুর	৬৪.৮	৩৪.৮
১২। নদীয়া	৬১.২	৩৭.৪
১৩। যশোহর	৬০.২	৩৯.৪
১৪। মালদহ	৫৬.৮	৩৭.৮
১৫। মুর্শিদাবাদ	৫৬.৬	৪১.৭
১৬। দিনাজপুর	৫০.২	৪০.২

(যেসব জেলায় হিন্দু সংখ্যা বেশী)

জেলার নাম	শতকরা কতজন হিন্দু	শতকরা কতজন মুসলমান
১। মেদিনীপুর	৮৪.১	৭.৭
২। বাঁকুড়া	৮৩.৬	৪.৩
৩। হুগলী	৭৯.৮	১৫
৪। হাওড়া	৭৯.৫	১৯.৯

www.pathagar.com

৫।	বর্ধমান	৭৩.৭	১৭.৮
৬।	কলিকাতা	৭২.৬	২৩.৬
৭।	বীরভূম	৬৫.৫	২৭.৪
৮।	চব্বিশ পরগণা	৬৫.৩	৩২.৫
৯।	জলপাইগুড়ি	৫০.৬	২৩
১০।	খুলনা	৫০.৩	৪৯.৪

বাউন্ডারি কমিশন

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুনের পরিকল্পনার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যকার সঠিক সীমানা নির্ধারণ করার জন্য একটি বাউন্ডারি কমিশন গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গ সীমানা নির্ধারণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবেন এটাই স্বাভাবিক ছিল। এমতাবস্থায় লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয় দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে উভয়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি নীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ৮ জুন ১৯৪৭ তারিখে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সহ অন্যান্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। জিন্নাহ সাহেব বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের বাউন্ডারি কমিশনের প্রতিটিতে প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির তিনজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁরা বৃদ্ধবয়সে ভারতবর্ষের গরম সহ্য করতে পারবেন না–এই অজুহাতে মাউন্টব্যাটেন উক্ত প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তখন জিন্নাহ সাহেব বিকল্প প্রস্তাব হিসেবে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রতি কমিশনে তিনজন করে অ-ভারতীয় বিশেষজ্ঞকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিতে কমিশন গঠন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং যেহেতু ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর পূর্বেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করতে হবে তাই জিন্নাহর দ্বিতীয় প্রস্তাবও নাকচ করা হয়।

১০ জুন ১৯৪৭ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রতি কমিশনে ২ জন মুসলিম লীগ ও ২ জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং উভয় কমিশনের জন্য একজন নিরপেক্ষ চেয়ারম্যান নিয়োগের প্রস্তাব করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিরপেক্ষ চেয়ারম্যানের নাম প্রস্তাব করবে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ হবেন বিচার বিভাগীয়।

১২ জুন নেহেরু কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স' কী হওয়া উচিত তার খসড়া গভর্নর জেনারেলকে প্রদান করা হয়। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উক্ত খসড়ায়

www.pathagar.com

নেহেরুর প্রস্তাব ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) বাংলার দুই অংশের সীমানা মুসলমান ও অমুসলমানগণ যে-সকল সংলগ্ন এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ তা নির্ণয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে সীমানা নির্ধারণ করার সময় অন্যান্য বিষয়ও (Other factors) বিবেচনায় রাখতে হবে।

(২) সিলেটে গণভোটের ফলাফল যদি উক্ত জেলার পূর্ববাংলার সংযুক্তির পক্ষে হয় তাহলে বাংলার বাউন্ডারি কমিশনই সিলেটের ও সিলেট সংলগ্ন জেলাসমূহের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নির্ধারণের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করবেন।

১৩ জুন ১৯৪৭ মাউন্টব্যাটেন লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা আহ্বান করেন। নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালিনী, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, সরদার আব্দুর রব নিশতার ও বলদেব সিং উক্ত বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকে উভয় দল একটি সমঝোতায় উপনীত হন এং নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১) একজন নিরপেক্ষ সভাপতি এবং মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ২ জন করে মোট ৪ জন সদস্য সমন্বয়ে বাউন্ডারি কমিশন গঠিত হবে।

(২) সদস্যবৃন্দ বিচার বিভাগীয় হবেন।

(৩) জিন্নাহ ও নেহেরু স্ব স্ব দলের প্রতিনিধিদের নাম গভর্নর জেনারেলের নিকট জমা দিবেন।

(৪) প্রতি বাউন্ডারি কমিশনের সদস্যবৃন্দ বৈঠকে বসে একজন নিরপেক্ষ সভাপতির নাম সুপারিশ করবেন। তারা এ কাজে ব্যর্থ হলে লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যৌথ বৈঠকে তা ঠিক করবেন।

(৫) টার্মস অব রেফারেন্স সংক্রান্ত ইতিপূর্বে পেশকৃত নেহেরুর খসড়া রিপোর্টটি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিবেচনা করে তাদের মতামত গভর্নর জেনারেলকে অবহিত করবেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রসঙ্গে জিন্নাহ ২৩ জুন গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিমত ব্যক্ত করেন যে একজন ব্রিটিশ বিচারক বাংলা ও পাঞ্জাব এই উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হতে পারেন এবং তিনি Arbitration Tribunal এরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেতে পারেন। এই প্রস্তাবের উত্তরে গভর্নর জেনারেল জিন্নাহকে অবহিত করেন যে, Arbitration Tribunal-এর চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ভারত সচিব কর্তৃক প্রস্তাবিত হয়েছে। জিন্নাহও পরদিন র‍্যাডক্লিফকেই বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণের জন্য মুসলিম লীগের সম্মতির কথা গভর্নর

www.pathagar.com

জেনারেলকে জানিয়ে দেন। গভর্নর জেনারেল ২৬ ও ২৭ জুন অনুষ্ঠিত অন্তর্বর্তীকালীন ক্যাবিনেট সভার বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে জিন্নাহর সুপারিশ অবহিত করেন। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ র‍্যাডক্লিফকে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে জিন্নাহ এবং নেহেরু কমিশনের স্বীয় দলের সদস্য-প্রতিনিধির নাম ভাইসরয়ের নিকট জমা দেন। মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন ঃ

১. কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি আবু সালেহ মোহাম্মদ আকরম এবং

২. পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এ. রহমান।

কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যরা ছিলেন ঃ

১. বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস এবং

২. বিচারপতি বিজন কুমার মুখার্জি। উভয়ই কলকাতা হাইকোর্টের।

এসময় আসামের গভর্নর সিলেটের পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আসাম বাউন্ডারি কমিশন গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু বাংলা বাউন্ডারি কমিশনই আসাম-সিলেট অঞ্চলের সীমানা চিহ্নিত করবেন–ইতিপূর্বে গৃহীত কংগ্রেস-লীগের এই সিদ্ধান্তের আলোকে আসাম গভর্নরের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ৩০ জুন ১৯৪৭ তারিখে বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের সদস্যদের নাম সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলা কমিশন পূর্ববাংলা ও আসামের সীমানা চিহ্নিত করবেন। ৪ জুলাই ভাইসরয় বাংলা ও পাঞ্জাব কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফের নাম ঘোষণা করেন। স্যার র‍্যাডক্লিফ ৮ জুলাই দিল্লী পৌঁছেন এবং অনতিবিলম্বে ভাইসরয়, কমান্ডার ইন চিফ, এবং লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এই ধারণা পান যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যেই সীমানা চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করতে হবে। ১০ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় র‍্যাডক্লিফ এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নেন যে, সীমানা চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ২২ জুলাই অনুষ্ঠিত পার্টিশন কাউন্সিলের সভায় লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে র‍্যাডক্লিফ আরো পাশ করিয়ে নেন যে, তার কোনো সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না এবং কমিশন যেরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে লীগ ও কংগ্রেস তা হুবহু মেনে নেবে। ফলতঃ কমিশনের চেয়ারম্যান হন সর্বেসর্বা। প্রকৃতপক্ষে সদস্যদের কোনো ক্ষমতাই ছিল না।

www.pathagar.com

বাউন্ডারি কমিশনের কার্যাবলী

স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ দিল্লীতে বসেই সীমানা চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শুধু একবার কলকাতা সফর করে যান। কমিশনের সদস্যগণ কলকাতা ও লাহোর থেকে প্রত্যহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তাঁর নিকট দিল্লীতে প্রেরণ করবেন বলে তিনি নিয়ম করেন। সেখানে দলকে সীমানা সংক্রান্ত দাবিনামা পেশ করার আহ্বান জানান। জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে বাংলা কমিশন ১৬ জুলাই থেকে ২৪ জুলাই আগ্রহীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। কংগ্রেস, বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবিনামা পেশ করা হয়।

১৯৪৭ সালের ৬ থেকে ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোট অনুযায়ী সিলেট জেলা পূর্ববাংলার সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানকার সীমানা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কমিশন ৪ থেকে ৬ আগস্ট কলকাতায় এক বৈঠক আহ্বান করেন। বৈঠকে আসাম সরকার ও পূর্ববাংলা সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও আসাম প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিবর্গ এবং পূর্ববাংলা মুসলিম লীগ ও সিলেট জেলা মুসলিম লীগের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে দাবিনামা পেশ করা হয় তাতে বাংলার মোট ৭৭,৪৪২ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে ৪০,১৩৭ বর্গমাইল দাবি করা হয়। দাবিকৃত এলাকার জনসংখ্যা ছিল অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ৪৫%, তন্মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৩২% এবং বাকিরা অমুসলমান। কংগ্রেস যে-সমস্ত এলাকা দাবি করে সেগুলো হচ্ছে গোটা বর্ধমান বিভাগ, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলাসমূহের সামান্য অংশ বাদে গোটা প্রেসিডেন্সি বিভাগ, রাজশাহী বিভাগের দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, রংপুর জেলা থেকে ডিমলা ও হাতিবান্ধা থানা, দিনাজপুর জেলার পশ্চিমাংশ এবং নবাবগঞ্জ মহকুমা বাদে মালদহ জেলা, ঢাকা বিভাগের বরিশাল জেলা থেকে গৌরনদী, নজীপুর, স্বরূপকাঠি এবং ঝালকাঠি থানাসমূহ, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমা ও রাজৈর থানা। ভারত ভূ-খণ্ডের সঙ্গে আসামের রেল-যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস রংপুর জেলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা ভুরুঙ্গামারীও দাবি করে বসে। কংগ্রেস কলকাতা শহর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি পেশ করে। তাদের দাবির সপক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, ১৯৪১-এর আদমশুমারী অনুযায়ী কলকাতা শহরে

www.pathagar.com

মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ২৩.৫৯% (মোট ২,১০৮,৮৯১ এর মধ্যে ৪,৯৭,৫৩৫) কর প্রদানকারী মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ১৪.৮% (৬৮,৫৬৭ এর মধ্যে ১০,১৪৯) এবং কলকাতা শহরের ৮১,১৫৯টি বাড়ির মধ্যে মুসলমান বাড়ির সংখ্যা মাত্র ৬,৮৬৩ (৮.৪৫%)। কংগ্রেস আরো উল্লেখ করে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত বেসরকারি সাহায্যের মধ্যে মুসলমানদের দান মাত্র ১% (প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখের মধ্যে মাত্র ১ লাখ) কংগ্রেস আরো যুক্তি দেখায় যে কলকাতার আশেপাশে যে ১১৪টি পাটকল আছে তার সবগুলি মালিক অমুসলমান ব্যক্তিবর্গ। সুতরাং সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বাংলা বিভক্ত করলে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কলকাতা শহর ও এর অধিবাসীদের প্রয়োজনে (রসদ সরবরাহ নিশ্চিত করতে, নদী, সড়ক ও রেল যোগাযোগ নির্বিঘ্ন রাখতে, প্রভৃতি) মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, যশোর জেলাসমূহ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও জেলাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অপরপক্ষে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিভাগের বেশিরভাগ অংশ এবং বর্ধমান জেলাসমূহ হুগলি ও ভাগীরথীর পূর্বাংশ পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করা হয়। মুসলিম লীগের দাবিতে বলা হয় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে এবং পুর্ববাংলার অর্থনীতির প্রয়োজনে এই জেলাগুলি পূর্ববাংলাভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সপক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে নদী ও এর শাখা নদীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ নদীগুলি জলপাইগুড়ির তিস্তা দিয়ে প্রবাহিত। তাছাড়া পুর্ববাংলার রেলপথ সংরক্ষণের একমাত্র উৎস হচ্ছে জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং-এ অবস্থিত পাহাড়ের পাথর। পূর্ববাংলার কাঠের চাহিদা মেটানো হত জলপাইগুড়ি জেলার বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত কাঠ থেকে। সুতরাং মুসলিম লীগ দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাদ্বয় পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি পেশ করে। পূর্ববাংলায় ভবিষ্যতে হাইড্রো-ইলেকট্রিক শক্তি উৎপাদনের জন্য কর্ণফুলী নদীর অধিকার আবশ্যক। এজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্তির দাবি করা হয়।

মুসলিম লীগ কলকাতা শহর পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবি পেশ করে। মুসলিম লীগ যুক্তি পেশ করে যে, কলকাতা শহরটি গড়ে উঠেছে মূলত পূর্ববাংলার সম্পদ দিয়ে। পৃথিবীর ৮০% পাট পূর্ববাংলায় উৎপাদিত হয় এবং ঐ পাট দিয়েই কলকাতার আশেপাশের পাটকল চলে। তাছাড়া কলকাতা

www.pathagar.com

ছিল বাংলার একমাত্র সমুদ্র বন্দর। উক্ত বন্দরে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারী নাবিকরা মূলত পূর্ববাংলার লোক। অতএব কলকাতা পূর্ববাংলারই প্রাপ্য।

এইভাবে কংগ্রেস ও লীগের দাবিদাওয়ার মীমাংসা করা কমিশনের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ ব্যক্তিগতভাবে এ সব দাবিদাওয়া সম্পর্কে কোনো পক্ষকে সাক্ষাৎকার দেননি। তিনি বুঝতে পারেন যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি নিজের ইচ্ছেমত সীমানা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। সীমানা চিহ্নিত সংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উদ্ভাবন করেন, যেমন ঃ

ক. বাংলার কোন অংশকে কলকাতা শহর প্রদান করা উচিত? এই শহরকে দ্বিখণ্ডিত করে উভয় অংশকে খুশি করা কি সম্ভব?

খ. সমগ্র কলকাতার সঙ্গে কোনো একটি অংশকে প্রদান করার পিছনে নদীয়া কিংবা কুলট নদীকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না।

গ. টার্মস অব রেফারেন্সে উল্লেখিত 'সম্প্রদায়গত সংলগ্ন এলাকার' নীতিকে উপেক্ষা করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা যশোর ও নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা যথার্থ হবে কি না।

ঘ. মালদহ ও দিনাজপুর জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও কিছু অংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা কি পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক হবে?

ঙ. দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু জেলাদ্বয়ের মুসলিম জনসংখ্যা অত্যন্ত কম (১৯৪১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী দার্জিলিং-এ মাত্র ২.৪২% ও জলপাইগুড়িতে ২৩.০৮%।) সুতরাং এই জেলাদ্বয় কোন অংশে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত?

চ. পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলিম জনসংখ্যা মাত্র ৩% হলেও জেলাটি চট্টগ্রাম জেলার অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই জেলাটি কোন ভূখণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে?

মাউন্টব্যাটেনের ৩ জুন পরিকল্পনায় যদিও 'সম্প্রদায়গত সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং এলাকার সংলগ্নতা' (Majority and Contiguity Principles)-এর ভিত্তিতে সীমানা চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু র‍্যাডক্লিফ উক্ত নীতি এবং লীগ-কংগ্রেস-এর সমঝোতা নীতিকে উপেক্ষা করে নিজের বিচারবুদ্ধিমতো সীমানা চিহ্নিত করেন। জনসংখ্যা, ভৌগোলিক অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সীমানা নির্ধারণ করলে অন্তত কয়েকমাস সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ তার দিল্লী অফিসে বসে টেবিলের উপর ভারতবর্ষের মানচিত্র রেখে মাত্র ১ সপ্তাহের মধ্যে হাজার হাজার মাইলের সীমানা

www.pathagar.com

চূড়ান্ত করেন। এই কাজ করতে তিনি মাউন্টব্যাটেন কর্তৃক প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ১৫ জানুয়ারী ১৯৫০ সালে কলকাতার এক জনসভায় উল্লেখ করেন যে, 'আমরা ভারত বিভাগে রাজি হওয়ার পূর্বশর্তস্বরূপ কলকাতা শহর যেন ভারতভুক্ত থাকে তার নিশ্চয়তা চেয়েছিলাম। আমাদেরকে সে নিশ্চয়তা দেয়া হলে আমরা ভারত বিভক্তিতে সম্মত হই'। মাউন্টব্যাটেন যেভাবেই হোক কলকাতা ভারতকে দেবেন বলে অঙ্গীকার করেছিলেন। সম্ভবত সেজন্যেই তিনি বাউন্ডারি কমিশনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য কিংবা জাতিসংঘের মনোনীত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা সমর্থন করেননি। যাহোক, র‍্যাডক্লিফের ঘোষণায় কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ ভুক্ত করা হয়।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত জেলাগুলো পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে ঃ ১। ঢাকা ২। ময়মনসিংহ ৩। ফরিদপুর ৪। বাখরগঞ্জ (বরিশাল) ৫। চট্টগ্রাম ৬। ত্রিপুরা ৭। নোয়াখালী ৮। পাবনা ৯। বগুড়া ১০। রংপুর ১১। রাজশাহী। নদীয়া, দিনাজপুর এবং মালদহ জেলা পূর্ববালা এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলো। নদীয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬১% মুসলমান) জেলা হওয়া সত্ত্বেও এর দুই তৃতীয়াংশ এলাকা পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়। বাকি অংশ চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর এবং কুষ্টিয়া মহকুমা পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে। অবিভক্ত দিনাজপুরের ৩০টি থানার মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকাসহ ৯টি থানা ও একটি থানার অংশ বিশেষ পশ্চিমবঙ্গের ভাগে দেয়া হয়। অপর পক্ষে ২০টি থানা সম্পূর্ণভাবে, ১টি থানা আংশিকভাবে (হিলি) পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়। মালদহ জেলার (৫৭% মুসলমান) চাপাই নওয়াবগঞ্জ মহকুমা পূর্ববাংলাকে দেওয়া হয়। বাকি অংশ (মালদহের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয়। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে ৪টি থানা যথা- দেবীগঞ্জ, বোদা, তেঁতুলিয়া ও পঞ্চগড় পূর্ববাংলার ভাগে পড়ে। সম্পূর্ণ মুর্শিদাবাদ জেলা (৫৬.৬% মুসলমান) পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা হয়। যশোহর জেলার বনগাঁও (৫৩% মুসলমান) ও গাইঘাটা থানা বাদে গোটা যশোহর জেলা পূর্ববাংলাকে দেওয়া হলো। খুলনা (৪৯.৩৬% মুসলমান) জেলাকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হয়েছিল। এ কারণে খুলনা জেলায় তিনদিন ভারতীয় পতাকা উড্ডীন ছিল। কোলকাতার বেলভেডিয়ার হাউজে সীমান্ত নির্ধারণী মামলায় এ.কে. ফজলুল হক স্যার র‍্যাডক্লিফের নিকট ওকালতি করে খুলনা জেলাকে পূর্ব বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন। পরে জানা গেল মুর্শিদাবাদ জেলার বদলে খুলনাকে পূর্ব বাংলার ভাগে দেওয়া হয়েছে। মুসলমান অধ্যুষিত মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকা ভারতকে প্রদানের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ পাবর্ত্য চট্টগ্রাম পূর্ববাংলাকে দেয়া হয়। অবশ্য পাবর্ত্য চট্টগ্রাম গ্রহণের ব্যাপারে

www.pathagar.com

কংগ্রেসের ততটা আগ্রহ ছিল না।

আসামের সীমানা চিহ্নিতকরণ সম্পর্কিত টার্মস অব রেফারেন্সের বিষয়ে সীমানা কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। মুসলমান সদস্যরা দাবি করেন যে, পূর্ববাংলার সংলগ্ন আসামের সকল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পূর্ববাংলায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অন্যদিকে হিন্দু-সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন যে, কমিশনের ক্ষমতা কেবল সিলেট জেলা সংলগ্ন আসামের সীমানা নির্ধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কমিশনের চেয়ারম্যান হিন্দু-সদস্যদের মত সমর্থন করেন।

সিলেট জেলার ৩৫টি থানার মধ্যে মাত্র ৮টি থানায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ; তার মধ্যে ২টি থানা সুল্লা ও আজমিরীগঞ্জ–চারিদিকে মুসলমান থানা দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। বাকি ৬টি থানা সিলেটের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে একটানা অবস্থিত ছিল–তবে মূল সিলেটের সঙ্গে থানাগুলির কোনো সংযোগ ছিল না। অপরদিকে কাচার জেলার হাইলাকান্দি মহকুমা ছিল মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তা সিলেটের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বদরপুর ও করিমগঞ্জের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এই এলাকা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের দক্ষিণের ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানার সঙ্গে আসামের কোনো সংযোগ থাকে না, আবার ৬টি থানাই আসামের অন্তর্ভুক্ত করলে সিলেটের সঙ্গে পূর্ববাংলার রেল–যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কমিশনের চেয়ারম্যান মনে করেন যে, কিছু মুসলমান এলাকা ও হাইলকান্দি মহকুমা অবশ্যই আসামের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং দক্ষিণ সিলেটের ও করিমগঞ্জ মহকুমার ৬টি অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা পূর্ববাংলার অন্তর্ভুক্ত করে তার বিনিময়ে পাথরকান্দি, বাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ এবং বদরপুর–এই চারটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ থানা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ ৪টি থানাকে পূর্ববাংলায় রাখার জন্য আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বাউন্ডারী কমিশনের নিকট স্মারক লিপি পেশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে তার সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়। কোলকাতায় তখন সাম্প্রদায়িক দাংগা চলছে। স্মারকলিপি পেশ করার জন্য তারা যে গাড়িতে ওঠেন তার শিখ ড্রাইভার তাদেরকে নিয়ে বলি দেবার জন্য কালিঘাট অভিমুখে রওনা দেয়। শারীরিক শক্তি প্রয়োগে ড্রাইভারকে তারা সে চেষ্টা নিবৃত্ত করেন এবং ভেলভেডিয়ারে গিয়ে তারা কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

যদিও ১৫ আগস্টের পূর্বেই সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও বাস্তবায়নের কথা ছিল কিন্তু স্বাধীনতা দিবসের কোনো কর্মসূচি যাতে সীমানা সংক্রান্ত ক্ষোভের কারণে ব্যহত না হয় সেজন্য মাউন্টব্যাটেন তা ১৬ আগস্ট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। যথারীতি ১৬ আগস্ট বিকেল পাঁচটায় ভাইসরয়ের বাড়িতে পার্টিশন কাউন্সিলের

www.pathagar.com

সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় পাকিস্তানের ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় যথাক্রমে লিয়াকত আলী খান ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল, সরদার বলদেব সিং, আবদুর রব নিশতার, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ভি.পি. মেনন উপস্থিত হন। সভা শুরুর তিন ঘন্টা পূর্বে সীমানা কমিশনের রিপোর্ট প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই রিপোর্ট কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং শিখ প্রতিনিধিদের কাউকেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। দুই ঘন্টা ধরে সভায় হট্টগোল এবং বাদ-প্রতিবাদ চলে। তবে শেষ পর্যন্ত সকলেই স্বীকার করেন যে, যেহেতু সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্তে কেউই খুশি হতে পারেননি, তার অর্থ প্রত্যেক পক্ষ কোথাও-না-কোথাও কিছু সুবিধা লাভ করেছে যা অন্য পক্ষকে অসন্তুষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষ সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্মত হয় এবং তা শান্তিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার ঐকমত্য ঘোষণা করে।

বাংলা বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নবগঠিত পূর্ববাংলা অবিভক্ত বাংলার মোট আয়তনের ৬৩.৮০% এবং মোট জনসংখ্যার ৬৪.৮৬ লাভ করে। বৃহত্তর বাংলার মুসলমান জনসংখ্যার ৮৩.৯৪% এবং অমুসলমান জনসংখ্যার ৪১.৭৮% পূর্ববাংলাভুক্ত হয়। নবগঠিত পূর্ববাংলার মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ৭০.৮৩ ঃ ২৯.১৭। নগগঠিত পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান ও অমুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত হয় ২৫.০১% ঃ ৭৪.৯৯%।

বাংলার বাউন্ডারি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনেক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার মুসলমানদেরকে অবাক ও বিস্মিত করে। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি এলাকার মুসলমানগণ ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে আনন্দ উৎসব করে, অথচ পরবর্তীতে তারা জানতে পারে যে, তারা ভারতভুক্ত হয়েছে। সরেজমিনে তদন্ত না করে দিল্লীর অফিস কক্ষে বসে মানচিত্রের উপর সীমানা চিহ্নিত করায় সীমানা কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি গ্রামকে দ্বিখণ্ডিত করে, কোথাও তা বাড়ির আঙিনার মাঝখান দিয়ে যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কারো ঘরের দরজা পড়েছে পাকিস্তানে, জানালা পড়েছে ভারতে।

সীমানা কমিশনের সিদ্ধান্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাময়িক ক্ষোভ সৃষ্টি করলেও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ চাপা পড়ে যায় দেশত্যাগ, দাঙ্গা ও লুটপাটের ঘটনার যাঁতাকলে।

১৯৪৭ সালে ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে সমগ্র বাংলা বিভক্ত হলো। একটি পূর্ববাংলা অপরটি পশ্চিম বঙ্গ। পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হলো। অপরদিকে পশ্চিম বঙ্গ হলো ভারতের একটি প্রদেশ। পাকিস্তান হলো মুসলমানদের দেশ।

www.pathagar.com

বাংলা ভাগের সময় রাজনীতিবিদ ও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ কালে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ইংরেজ কর্মকর্তা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, পাঞ্জাবের বলদেব সিং, বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হিন্দু মহাসভাব ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, বাংলা কংগ্রেসের শরৎচন্দ্র বসু ও ড. কিরণ শঙ্কর রায়, বাংলা মুসলিম লীগের আবুল হাশিম, বৃটিশ সরকারের পক্ষে ছিলেন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন, তার শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টা ডিপি মেনন, স্টাফ অফিসার লর্ড ইজমে, বাংলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ, পাঞ্জাবের গভর্ণর স্যার উভান জেংকিনস, ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল স্যার ক্লড অখিললেক এবং স্যার সিসিল র‍্যাড ক্লিফ।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বংশগত পটভূমির দিক থেকে গান্ধীর সংগে জিন্নাহর মিল ছিল। এদের দুজনেরই পূর্বপুরুষ গুজরাটের কাথিয়াবাড়ি এলাকায় বসবাস করতেন। জিন্নাহর পিতামহ এবং গান্ধীর পিতামহ ছিলেন আপন চাচাতো ভাই। তারা বৈশ্যবংশোদ্ভুত ছিলেন। হিন্দু বর্ণাশ্রম প্রথা অনুসারে বৈশ্যদের স্থান ছিল তৃতীয় সারিতে। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে জিন্নাহর পিতামাতা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করে করাচীতে আসেন। ১৮৭৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর খৃষ্টীয় বড়দিনে করাচীতে জিন্নাহর জন্ম হয়। একজন মুসলমানের ন্যায় তিনি প্রতিপালিত হন। ১৫ বছর বয়সে জিন্নাহ কাথিয়াবাড়ির এগারও বছরের এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। পরের বছর জিন্নাহ আইন পড়ার জন্য বিলাত গমন করেন। কিন্ত বিলাতে অবস্থান কালেই তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মাত্র ষোল বছর বয়সে জিন্নাহ লন্ডনে আইন অধ্যয়ন শুরু করেন। দু'বছর সময়ের মধ্যেই তিনি লিঙ্কন্স-ইনের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু কুড়ি বছর বয়স না হলে ব্যারিস্টারী

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

www.pathagar.com

সনদ পাওয়ার নিয়ম না থাকায় তাঁকে আরও দু'বছর ইংল্যান্ডে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে তিনি বোম্বাইতে আইন ব্যবসা শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই একজন জাঁদরেল আইনজীবী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এ সময় তাঁর শত্রু-মিত্র সবাই তাঁকে উদ্বত মিষ্টার জিন্নাহ এবং সৎ মিঃ জিন্নাহ নামে ডাকতে শুরু করেন। ত্রিশ বছর বয়সে জিন্নাহ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর কয়েক বছর পর তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ভারতকে বৃটিশ শৃঙ্খল মুক্ত করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ক্রিয়া-কর্মে সমন্বয় সাধন করা। তিনি ও তাঁর দল মুসলিম লীগ ভারত বিভাগ চাইতেন কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তি চাননি। বাংলাকে অবিভক্ত রাখার ব্যাপারে জিন্নাহ সাহেব লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সাথে রীতিমত ঝগড়া করেন। লাহোর প্রস্তাব পরিবর্তন করে জিন্নাহ মারাত্মক ভুল করেছিলেন বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। তাদের ধারণা লাহোর প্রস্তাব অপরিবর্তিত থাকলে ভারতের পূর্বাঞ্চলে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হতো। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালিরাও বাংলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে মত দিত। ১৯৪৫ সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে জিন্নাহ সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেসের চাপে বৃটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করে ফেলতে পারে এবং আসামের অধিকাংশ অঞ্চল হাত ছাড়া হয়ে যেতে পারে। এমতাবস্থায় খন্ডিত বাংলা ও আসামের যেটুকু পাওয়া যেতে পারে তা দিয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র হলে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। পূর্বাঞ্চলে এ ক্ষুদ্র দুর্বল রাষ্ট্রটিকে পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ অংশের সংগে একত্র করে এক রাষ্ট্র করাই সর্বোত্তম উপায় বলে তিনি বিবেচনা করেন। এ কারণেই '৪৬-এর মার্চে দিল্লীতে লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ডেকে দুই রাষ্ট্রের পরিবর্তে এক রাষ্ট্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের রচিত 'ইতিহাস কথা কয়' গ্রন্থ থেকে জানা যায় মৃত্যুশয্যায় জিন্নাহ সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্ণেল এলাহী বক্সের সংগে আলোচনা প্রসংগে এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে, দেখ ডাক্তার আমি লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃতি করে ভুল করেছি যা দেশের একজন নেতা হিসেবে আমার আদৌ উচিৎ হয়নি। আমি দিব্যি চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব মানবে না। তারা নিশ্চয়ই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, ওদের উপর বিমাতা সুলভ আচরণ। পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে ওদের ত্যাগের জন্যই এসেছে। জিন্নাহ সাহেবের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং আমরা ১৯৭১ সনে পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিশ্বের বুকে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করতে সক্ষম হই।

www.pathagar.com

মহাত্মা গান্ধী ঃ মহাত্মা গান্ধী ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের কাথিয়াবাড়ি এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পুরোনাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, সংক্ষেপে এম.কে গান্ধী। গান্ধী এবং জিন্নাহ একই বংশের লোক ছিলেন। গঙ্গানারায়ণ চন্দ্রের ভাষায় ঃ 'মি. মহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও শ্রী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পিতামহ ছিলেন এক সম্প্রদায়ভুক্ত গুজরাটী হিন্দু।' গান্ধীজী তের বছর বয়সে ১০ বছরের বালিকা শ্রীমতি কস্তুরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। লন্ডন থেকে গান্ধী ব্যারিস্টারী পাশ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানকার ভারতীয় জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি তার এই জাঁকালো পেশাটি ছেড়ে দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৯১৭ সালে গান্ধী কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি গণ-আন্দোলন পরিচালনায় পারদর্শী ছিলেন এবং অহিংসা, অসহযোগ আইন অমান্য আন্দোলন, বিলেতি দ্রব্য বর্জন ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেস প্রথমে গান্ধীর এসব নীতি ও পন্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলনা। কিন্তু এসময় ভারতের মুসলমানরা খেলাফতের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিল। খেলাফত আন্দোলন ইতিপূর্বে শুরু হয়েছিল। গান্ধীজী তাঁর পরিকল্পিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সহজেই খেলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীদের সমর্থন লাভ করেন। পরে কংগ্রেসও গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ফলে ১৯২১ সাল নাগাদ খেলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক যৌথ আন্দোলনে পরিণত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত রক্ষা ও স্বরাজ অর্জন ও অসহযোগের মাধ্যমে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে সরকারকে দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা। এতে অংশগ্রহণকারীরা খেতাব ও চাকরি বর্জন করে, অফিস আদালত ত্যাগ করে, বিলেতি পণ্য পরিহার করে। অবশেষে সরকারের কর ও খাজনা প্রদানও বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রদের স্কুল কলেজ বর্জনও এই আন্দোলনের কর্মসূচীভূক্ত ছিল।

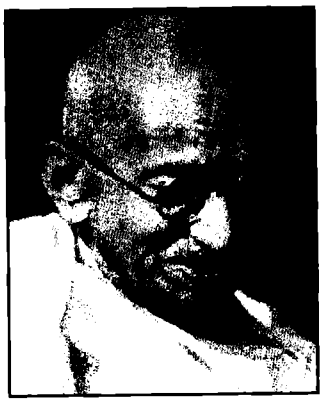
মহাত্মা গান্ধী

হিন্দু মুসলমানের এই মিলিত আন্দোলন সারা ভারত জুড়ে এক মহা শক্তিশালী গণ–আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর অহিংস স্বরাজ আন্দোলন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরা নামক এক জায়গায় একদল জনতা এক থানা আক্রমণ করে ২১ জন সিপাহী ও একজন

www.pathagar.com

দারোগাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। একই সময়ে মোপলার, জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আন্দোলন এভাবে তীব্র আকার ধারণ করলে গান্ধীজী মর্মাহত হন এবং ১৯২২ সালে হঠাৎ সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এসব আন্দোলনের ফলে উপমহাদেশে এক অভুতপূর্ব গণজাগরণ আসে, স্বাধিকার আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। একাধিক কারণে গান্ধী ছিলেন একজন ঋষিও। তাঁর জীবনের তিনটি মহান উদ্দেশ্য ছিল ঃ ভারতের স্বাধীনতা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য এবং অস্পৃশ্যদের ভাগ্য উন্নয়ন। এই তিনটি উদ্দেশ্যে তিনি যেকোন ত্যাগ স্বীকার, এমনকি মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন। ভারত ভাগের সময় উপমহাদেশের রাজনীতিতে গান্ধীজী ছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি কখনও ভারত ভাগ চাননি। জওহরলাল নেহেরু ও বল্লভ ভাই প্যাটেলের চাপে ভারত বিভাগে রাজী হন। তিনি অখন্ড স্বাধীন বাংলা সমর্থন করেন নি। শরৎচন্দ্র বসু, আবুল হাশিম, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ফজলুর রহমান (ঢাকা), বগুড়ার মোহাম্মদ আলী ১৯৪৭ সালের মে মাসে গান্ধীজীর সংগে সাক্ষাৎ করে অখন্ড ও স্বাধীন বাংলা বিষয়ে তাঁর সমর্থন কামনা করেন। গান্ধীজী রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে স্বাধীন বাংলার বিষয়টি সুচতুরভাবে এড়িয়ে যান। তবে শরৎ বাবুকে একটি চিঠি লিখে আশ্বাস দেন যে তিনি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী কমিটিতে তাঁদের প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্বভৌম বাংলা সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ২০ মে স্বাক্ষরিত চুক্তির একটি কপিসহ শরৎচন্দ্র বসু ২৩ মে গান্ধীকে একটি পত্র পাঠান। গান্ধী তাঁর তাৎক্ষণিক জবাবে জানান, 'প্রিয় শরৎ, তোমার পত্র পেয়েছি। খসড়াটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা হবে না। প্রত্যেক আইনের জন্য কার্যনির্বাহীদের এবং আইন সভার হিন্দু সদস্যদের দুইতৃতীয়াংশের সমর্থন থাকতে হবে।'

সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধী ১৯৪৭ সালের ৮ জুন শরৎচন্দ্র বসুকে আরেকটি লিখিত পত্রের শেষাংশে বলেন ঃ তোমার উচিৎ হবে বাংলার অখন্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করা। দ্রঃ 'আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলার রাজনীতি;' আবুল হাশিম, ঢাকা, ১৯৮৭ পৃঃ ১৮০-৮১

১৫ আগষ্ট যেদিন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে সেদিন তিনি দিল্লীতে ছিলেন না। দেশ ভাগের বিষন্নতা তাঁকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে রাজধানীর আনন্দ উৎসবে তিনি শামিল হতে চাননি।এর কয়েকদিন পূর্বেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

www.pathagar.com

এ রকম অবস্থায় গান্ধীজী ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব ১৩ আগস্ট সাধারণ নাগরিক হিসেবে বেলিয়াঘাটায় হায়দারী ম্যানসনে এসে উঠেন। শহীদ সাহেব অবশ্য পরদিন পর্যন্ত নামকাওয়াস্তে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গান্ধীজীরা হায়দারী ম্যানসনে উঠার পর একদল আগ্রাসী হিন্দু তাদের লাঞ্ছিত করে। তারা বাড়িটির দরোজা জানালা ভাংচুর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বৃষ্টির মত ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। হিন্দুরা গান্ধীর কাছে জানতে চাইলো, 'আপনি কেন মুসলমানদের রক্ষা করতে এসেছেন? ক্ষতিগ্রস্ত তো হয়েছে হিন্দুরা।'

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রতি ইঙ্গিত করে তারা আরো বললো, 'যে ব্যক্তিটি অগণিত হিন্দুর মৃত্যু ও দুর্দশার জন্য দায়ী আপনি তাকেই কেন সঙ্গী করেছেন?' সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল সে সময় কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনিও গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, "আপনি দেখছি কলকাতায় আট্‌কে গেছেন। উঠেছেন এমন এক বাড়িতে যেটি একটি ভগ্নস্তূপ এবং হিংস্রতার জন্য পাড়াটাও সকলেরই পরিচিত। এবং সঙ্গী হিসেবেও একজন আদর্শ ব্যক্তিকে বেঁচে নিয়েছেন বটে।" যাই হোক, বেলিয়াঘাটার এই হিন্দুদের গান্ধী বললেন, 'আমি জন্মেছি হিন্দু হয়ে। বিশ্বাসের দিক দিয়েও হিন্দু এবং জীবন আচরণে আমি হিন্দুদের মধ্যেও এক কট্টর হিন্দু। আমি কি করে হিন্দুদের শত্রু হতে পারি।' যুক্তিটা সেই সহিংশ হিন্দুরা মেনে নিল এবং একে একে হায়দারী ম্যানসন ত্যাগ করল। তারপর প্রায় তিন সপ্তাহ কলকাতা শুধু যে শান্ত থাকলো তাই নয়। স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর যে দৃশ্য কলকাতার ঘরে ঘরে দেখা গেল তা মানবতার সর্বোচ্চ শিখরকে স্পর্শ করতে পারে।

কলকাতায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন দেখে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর রাজা গোপালচারী গান্ধীকে একজন যাদুকর বলে অভিহিত করেন। ১৫ আগস্ট হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান হায়দারী ম্যানসন-এ আসতে লাগলো মিছিল করে- এই যাদুকর ও তাঁর সঙ্গীকে দেখতে। ২৬ আগস্ট লর্ড মাউন্টব্যাটেন একটি টেলিগ্রাম পাঠালেন মহাত্মা গান্ধীকে। টেলিগ্রামের ভাষা ঃ প্রিয় গান্ধী, পাঞ্জাবে আমাদের কাছে ৫০ হাজার সৈন্য আছে। তবু দাঙ্গা থামাতে পারছিনা। বেঙ্গলে আমাদের লোকবল মাত্র একজন (গান্ধী)। কিন্তু একজনই শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। একজন সক্রিয় রাজকর্মচারী এবং প্রশাসক হিসেবে আমি কি সেই একজন দিয়ে গঠিত শক্তিকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে পারি? আমি অবশ্য আপনার 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' মি. সোহরাওয়ার্দীকেও ভুলে যাইনি।"

বেলিয়াঘাটার যে হায়াদরী ম্যানসন-কে গান্ধী ও সোহরাওয়ার্দী মন্দিরে বা সত্যিকার অর্থে শান্তি নিকেতনে পরিণত করেছিলেন, সেখানেই আবার হিংসার আগুন

www.pathagar.com

জ্বলে উঠে। ৩১ আগস্ট একদল উত্তেজিত হিন্দু হায়দারী ম্যানসনে এসে গান্ধীজীর সামনে বিষোদগার করতে শুরু করে। তাদের কাঁধে গুরুতর ভাবে আহত এক হিন্দু। তারা বললো মুসলমানরা তাকে ছুরি মেরেছে। গান্ধী উত্তেজিত হিন্দুদের শান্ত করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারা সেই বাড়িতে চড়াও হয়ে লোকজনদের এলো পাতাড়ি আক্রমণ করে। গান্ধী নিজেই আহত হন। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই ৫০ জন নিহত, ৩০০ জন আহত হয়। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সৈন্য ডাকা হলো।

গান্ধীজী ১৯৪৭-এর ১ সেপ্টেম্বর জনগণের শুভবুদ্ধি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় অনশন শুরু করেন। এরপর দাঙ্গা থেমে যায়। পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের বৈরী মনোভাব দূর করার লক্ষে গান্ধী পুনরায় শেষ বারের মত অনশন শুরু করেন। ভারত সরকার পাকিস্তানের প্রাপ্য অর্থের কতকাংশ পরিশোধ করে।

দেশ ভাগ নিয়ে আলোচনার সময় গান্ধী দিল্লীতে এলে দিল্লীর বিড়লা হাউজের ছোট একটি কামরায় উঠতেন। সেই বিড়লা হাউজের সামনের বাগানেই স্বাধীনতার ঠিক সাড়ে পাঁচ মাস পর ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ গান্ধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। সেদিন ভারতীয় সময় বিকেল ৫টা ৩ মিনিটে গান্ধী বিড়লা হাউজ থেকে বেরিয়ে এক প্রার্থনা সভায় যোগদান করছিলেন। তাঁর পরণে ছিল চিরাচরিত সাদা ধুতি ও পায়ে স্যান্ডেল। দুই হাতে দুই সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়েছিলেন। মুখে ছিল হাসি। বাগানে ছিল দুই থেকে তিনশ লোক। তিনি সিঁড়ি বেয়ে বাগানের উঁচু জায়গায় উঠছেন। ত্রিশ বছর বয়সী এক লোক ছিল একেবারে সামনে। সে একটি রিভলবার বের করে পর পর কয়েকটা গুলি চালালো। গান্ধী সংগে সংগে লুটিয়ে পড়লেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু [১৮৮৯-১৯৬৪] ঃ জওহরলাল নেহেরু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মতিলাল নেহেরু ছিলেন এলাহাবাদের একজন খ্যাতনামা আইনজীবী। বিপুল ভোগবিলাস এবং ক্রমাগত ইংরেজী প্রভাবাধীনে তিনি মানুষ হন। তাঁর জন্য সব সময় ইংরেজ গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হতো। নেহেরুদের বাড়িতে সর্বক্ষণ মেহমান লেগেই থাকতো। মেহমানদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ। হিন্দী এবং সংস্কৃতে বড় একটা উন্নতি না হলেও ইংরেজী ভাষায় তিনি দ্রুত পারদর্শী হয়ে ওঠেন। পনের বছর বয়সে তিনি লন্ডনের হ্যারো স্কুলে প্রবেশ করেন এবং ২২ বছর বয়সে তিনি ক্যাম্ব্রিজ থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে দেশে ফিরে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

www.pathagar.com

আসেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি ইংরেজ জাতির সংস্কৃতি আচার-আচরণ পূরাদস্তর রপ্ত করে ফেলেছিলেন। ১৯১২ সালে নেহেরু আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। তিনি গান্ধীর ভক্ত হলেও অনেক সময় তাদের মধ্যে দ্বিমত হত। মানুষ হিসেবে নেহেরু ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। গান্ধীর অহিংস নীতির সংগে তার কোন বিরোধ ছিল না। তিনি মোট ৫ বার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই হয়েছিল। লেখক হিসেবে তিনি স্বীকৃত। Autobiography, Glimpses of World History, Soviet Russia, Discovery of India তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রথম দিকে নেহেরু ভারত বিভাগে রাজী ছিলেন না। পরে তিনি ভারত ভাগ মেনে নিলেন। কিন্তু শর্ত জুড়ে দিলেন যে ভারতকে ভাগ করতে হলে পাঞ্জাব ও বাংলাকেও ভাগ করতে হবে।

সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ঃ সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল মহাত্মাগান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতা। বরদৌলীতে কৃষক সত্যগ্রহের সময় তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসার দাবীদার। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'শ্রী প্যাটেলের ধারণা ছিল মুসলিম লীগের সংগে কাজ করা যাবে না। তাই তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের সমর্থক হয়ে গেলেন। মি. জিন্নাহর চাইতেও বড় সমর্থক। দেশভাগের পতাকা উঠিয়ে ছিলেন মি. জিন্নাহ। পতাকার বাহক হলেন শ্রী প্যাটেল। শ্রী প্যাটেলকে ভারত বিভক্তির স্থপতি বল্লেও অন্যায় হবে না।' স্বাধীনতা লাভের পরে প্যাটেল ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন এবং নিপুনতার সাথে দেশীয় রাজ্যগুলোকে ভারতভুক্ত করেন। ১৯৫০ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন [১৯০০-১৯৭৯] ঃ ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত ভারতের শেষ ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন । তিনি ছিলেন রাণী ভিক্টোরিয়ার বংশধর। ব্রিটিশ রাজপরিবারের সন্তান। রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়েছিল ১৯০১ সালে, মাউন্টব্যাটেনের জন্ম ১৯০০ সালে। রাণীর হাতের ছোঁয়া ও স্নেহ-চুম্বন তিনি পেয়েছিলেন। তাই মাউন্টব্যাটেন তার সময়ে দেশের রাজাকে নাম ধরে এবং 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন।

মাউন্টব্যাটেন এডুইনা এ্যাশলে নামে এক অসাধারণ মহিলাকে বিয়ে করেন। বিয়ের আগেই এডুইনার সংগে তার প্রেম হয়েছিল। ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলসের এডিকং রূপে মাউন্টব্যাটেন প্রথম ভারত সফরে আসেন। তার একান্ত অনুরোধে সে সময় একবার এডুইনাও দিল্লী এসেছিলেন। সেখানেই এক অবসরে

www.pathagar.com

লর্ড মাউন্টব্যাটেন, নেহরু ও লেডি মাউন্টব্যাটেন।
সহযাত্রী গাড়িতে, উপমহাদেশের ভাগ্য নির্ধারণে

পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন বলে তারা স্থির করেন। তাই তাদের দু'জনের কাছেই ভারত মধুর স্মৃতির দেশ। মাউন্টব্যাটেন দম্পতি আবার দিল্লী এসেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তখন মাউন্টব্যাটেন দক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ার মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। নয়াদিল্লীর ফরিদকোট হাউসে তিনি কমান্ড সদর স্থাপন করেন। তিনি তখন বিরাট ক্ষমতার অধিকারী।

১৯৪৭ সালের মার্চে যখন ভাইসরয়রূপে ভারতে আসেন তখন মাউন্টব্যাটেনের বয়স ৪৭ বছর,এডুইনার ৪৬ বছর এবং মেয়ে পামেলার ১৭ বছর। মাউন্টব্যাটেনের একটা অসাধারণ গুণ ছিল, তিনি যে-কোন লোকের সংগে যে-কোন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতেন। তাকে কোন দায়িত্ব দেয়া হলে তিনি তা ঝটপট সেরে ফেলতেন।

উপমহাদেশকে খন্ডিত ও পঙ্গু করে দেয়াই ছিল ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের অনুকুলে জওহরলাল নেহেরুকে মাউন্টব্যাটেন পুরোপুরিভাবেই কাজে লাগিয়েছিলেন। পামেলা মাউন্টব্যাটেনের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের বশীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ বশীভূত হন নি। কারণ, ১৯৩৩ সালে লন্ডনে তাঁর মগজে 'পাকিস্তান পরিকল্পনা' ঢুকানো হয়েছিল। ব্রিটিশদের সংগে তাঁর বোঝা পড়া তখনই হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি

www.pathagar.com

জানতেন লর্ড এবং লেডি মাউন্টব্যাটেনকে তাঁর খাতির করার দরকার নেই। তাঁকে যে পাকিস্তান দেয়া হবেই, তা তিনি নিশ্চিত ভাবে জানতেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতে এসে দেখেছেন, তার নিজের Charm সবাইকে মুগ্ধ করে। শুধু জিন্নাহর ক্ষেত্রেই তিনি ব্যর্থ হলেন। পামেলার মন্তব্য ঃ He (জিন্নাহ) did not fall for my father's charm (পৃঃ ৭৭) এবং He (মাউন্টব্যাটেন) could not crack jinnah (পৃঃ ৭৫) অর্থাৎ মাউন্টব্যাটেন অন্য নেতাদের বাদাম ভাঙ্গার মত ভেঙ্গে ছিলেন, শুধু জিন্নাহকে ভাঙতে পারেন নি। গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল মাউন্টব্যাটেনের প্রতি এতই মুগ্ধ ছিলেন যে তারা ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভাইসরয়ের পদ পাল্টে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল করে রেখেছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের মনোবাসনা ছিল, একই সংগে পাকিস্তানেরও গভর্ণর জেনারেল হওয়ার। কিন্তু জিন্নাহ কিছুতেই রাজী হননি। অথচ ঐ প্রত্যাখানের পরও মাউন্টব্যাটেন নিজে কাশ্মীর গিয়েছিলেন মহারাজ হরিসিংকে বুঝিয়ে জম্মু-কাশ্মীরকে পাকিস্তানভুক্ত করানোর উদ্দেশ্যে। তার উদ্দেশ্যের কথা বুঝাতে পেরে হরিসিং গুরুতর অসুখের ভান করে পড়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের সংগে দেখাই করেন নি। ব্যর্থকাম হয়ে লর্ড ফিরে এসেছিলেন শ্রীনগর থেকে। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। জিন্নাহ জম্মু-কাশ্মীর দখল করার মুখে এসে গিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটেন নেহেরুকে রাজি করিয়েছিলেন কোন প্রতিরোধ না করতে। কিন্তু প্যাটেল তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠান। ভারতীয় সৈন্যরা যখন গোটা জম্মু-কাশ্মীর হানাদার মুক্ত করার কিনারে এসেছে তখন মাউন্টব্যাটেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে চাপ দিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে থেমে যাওয়ার আদেশ দেওয়ান। তারপরই তিনি জাতিসংঘে কাশ্মীর নিয়ে নালিশ জানাতে নেহেরুকে চাপ দিয়েছিলেন। ভারতের পক্ষে এই দুই সিদ্ধান্ত হয়েছিল আত্মঘাতী। নেহেরু অভিজ্ঞ ব্যক্তি হয়েও মাউন্টব্যাটেনের চাল ধরতে পারেন নি, এডুইনা তা ধরতে দেন নি। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সাথে আলাপ আলোচনা করে ভারত বিভক্ত ও পাকিস্তান সৃষ্টির প্রস্তাব মেনে নেন। স্বাধীন বাংলার প্রতি তিনি প্রথম দিকে খুবই সহানুভূতি ছিলেন। তিনি ১৯৭৯ সালের ২৭ আগস্ট আয়ারল্যান্ডের অদূরে ডোনেগাল বে-তে তাঁর নৌযানে এক বিস্ফোরণে নিহত হন।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন একজন ঝানু ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর এ মহান ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্সসহ বি.এস.সি এবং অক্সফোর্ড থেকে ইংরেজীতে এম,এ এবং

www.pathagar.com

হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

জুরিসপ্রুডেন্সে অনার্স ও বি,সি. এস পাশ করেন। ১৯১৮ সালে তিনি বার-এট-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবীতে এম,এ, ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯১৮ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর মমতা তাঁকে টেনে এনেছিল রাজনীতির সংঘাত মধুর জীবনে। ১৯২১ সালে তিনি সর্বপ্রথম খিদিরপুর শ্রমিক এলাকা থেকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এখান থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়।

তরুণ ব্যারিস্টার সোহরাওয়ার্দী কলকাতা খিলাফত কমিটির সেক্রেটারীরূপে মওলানা মুহম্মদ আলী ও মওলানা শওকত আলীর দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। তিনি ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ দলের সংগে এক চুক্তি করেন, যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' বা 'হিন্দু-মুসলিম চুক্তি' নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকৃতি পায়, স্থির হয় যে সরকারী চাকুরীতে মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে শতরা ৫৪ ভাগ চাকরী লাভ করবে এবং যতদিন ঐ সংখ্যানুপাত পুর্ণ না হবে ততদিন তারা শতকরা ৮০টি চাকুরী পাবে। কলকাতা কর্পোরেশন, বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ডেও মুসলমানরা ঐ হারে চাকুরী পাবে। এই অনুযায়ীই ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে শহীদ-দাস কোয়ালিশন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এর ফলে চিত্তরঞ্জন দাস কর্পোরেশনের মেয়র এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। এ সময় সোহরাওয়ার্দী সাহেব বঙ্গীয় যুব আন্দোলনেরও সভাপতি নির্বাচিত হন।

হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের জন্য সিমলা কনফারেন্সে সোহরাওয়ার্দী মুসলিম স্বার্থের পক্ষে প্রবলভাবে সংগ্রাম করেন। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের সুপারিশক্রমে গঠিত পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে সোহরাওয়ার্দী উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী উত্থাপন করেন। ১৯৩৬ সালে নতুন নির্বাচনের জন্য দেশে তোড়জোড় আরম্ভ

www.pathagar.com

হলে তাঁর প্রস্তাবে সম্মিলিত মুসলিম দল গঠিত হয়। মিঃ জিন্নাহর অনুরোধে সম্মিলিত মুসলিম দলের নাম বদলিয়ে 'মুসলিম লীগ' করা হয়। তাঁর অসাধারণ সংগঠনী প্রতিভা ও কর্মপ্রেরণার ফলে কৃষক প্রজা পার্টির তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আটত্রিশটি আসন দখল করে। ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাণিজ্য ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে হক সাহেব মুসলিম লীগে যোগদান করলে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি এবং শহীদ সাহেব সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বাংলার মুসলিম লীগকে নব জীবন দান করে পাকিস্তানের ভিত্তি রচনা করার কৃতিত্ব অনেকখানি সোহরাওয়ার্দীর প্রাপ্য।

২য় হক মন্ত্রীসভার পতনের পর খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে ১৯৪৩ সালে যে লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয় তাতে সোহরাওয়ার্দী খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চাউল আমদানী বন্ধ হওয়া, দেশে কর্ডনিং প্রথা প্রভৃতি কারণে ১৯৪৩ সালে বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। খাদ্য মন্ত্রী হিসেবে এ সময় তিনি শহর ও গ্রামবাসীদের মধ্যে রেশন প্রথা চালু করেন। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামাঞ্চলে লংগরখানা স্থাপন করে দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পরাজিত করে তিনি লীগ দলের নেতা নির্বাচিত হন। পাকিস্তান ইস্যুর ভিত্তিতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনী সংগ্রাম পরিচালিত হয় এবং তার সাংগঠনিক ক্ষমতা বলে মুসলিম লীগ বাংলার ১২১টি আসনের মধ্যে ১১৭টি আসন অধিকারে সমর্থ হয়। বাংলার মত আর কোন প্রদেশে মুসলিম লীগ এতখানি কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের ২রা এপ্রিল তিনি যোগ্যতার দাবীতেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের লীগ পার্লামেন্টারী দলের নেতা নির্বাচিত হন এবং তাঁর নেতৃত্বে ২২ এপ্রিল বাংলায় লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

১৯৪৬ সালের ১৯ জুলাই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত লীগ সম্মেলনে পাকিস্তান লাভের জন্য প্রয়োজন হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করা হবে বলে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৬ আগষ্ট মুসলিম লীগ সারা উপমহাদেশে সভাসমিতি করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেয়। ওই দিন চরমপন্থীদের প্ররোচনায় কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, কলকাতায় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র ২৪ ভাগ। সুতরাং এই দাঙ্গায় মুসলমান সম্প্রদায়ই অধিক

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করে দাংগা উপদ্রুত অঞ্চলে গমন করেন এবং দুর্গত লোককে সাহায্য করেন। দুর্গত লোকদের অধিকাংশ ছিল গরীব শ্রমিক ও বস্তীর বাসিন্দা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাদের রক্ষার দায়িত্ব সোহরাওয়ার্দীর উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারতে বাংলা নামে একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন সৃষ্টির আন্দোলনে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল ঃ 'রাজনীতিবিদ। তিনি অনুন্নত সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেন। ১৯০৪ সালের ২৯ জানুয়ারী বরিশাল জেলার মাইস্তারকান্দি গ্রামে তার জন্ম। নীচকুলে জন্মগ্রহণের কারণে বাল্যকালে যোগেন্দ্রনাথকে বর্ণহিন্দু পরিবার থেকে আসা সহপাঠীদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। সেকালে কলেজ প্রাঙ্গনে নিম্নবর্ণের হিন্দু ছাত্রদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। বস্তুতঃ বর্ণহিন্দু ছাত্রদের সংগে এক সারিতে সরস্বতী পূজায় অংশ গ্রহণ করা তাদের জন্য ছিল নিষিদ্ধ। যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলে তারা শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রীয় হবে। যোগেন্দ্রনাথ বি.এ. ও বি.এল ডিগ্রি অর্জন করার পর চাঁদমোহন চক্রবর্তীর জুনিয়র হিসেবে কলকাতা স্মল কলেস কোর্ট–এ আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ১৯৩৭ সালে বাংলা বিধান সভার নির্বাচনে বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব জেনারেল রুরাল কনস্টিটিয়েন্সি হতে অংশ গ্রহণ করেন এবং অশ্বিনী কুমার দত্তের উত্তরসূরি সরলকুমার দত্তকে পরাজিত করে এক অপ্রত্যাশিত বিজয় লাভ করেন। প্রায় সকল নমশুদ্র ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের হিন্দু ভোটাররা এবং বর্ণহিন্দুদের একটি অংশ যোগেন্দ্রনাথের পক্ষে ভোট দেয়। আইন পরিষদে নির্বাচিত হওয়ার পর যোগেন্দ্রনাথ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি শরৎবসু ও সুভাষ বসুর প্রশংসা লাভ করেন। পরবর্তীকালে যোগেন্দ্রনাথ ড. আম্বেদ কারের সংগে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং মুসলিম লীগের সংগে মৈত্রী স্থাপন করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ২০ জন নিম্নবর্ণের হিন্দু সদস্য নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন দেয় এবং তাদের তিন জন মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। যোগেন্দ্রনাথ সমবায় ঋণ ও গ্রামীণ ঋণবদ্ধতা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। ইতোমধ্যে তিনি অল ইন্ডিয়া সিডিউলড কাস্ট

www.pathagar.com

ফেডারেশন (এ.আই.এস.সি.এফ)-এর বাংলা শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার পতনের পর বাংলার গভর্ণরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫–৪৬ সালের শীত মৌসুমে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যোগেন্দ্রনাথ বাখেরগঞ্জ দক্ষিণ (সংরক্ষিত) নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের প্রতিপত্তি লক্ষ করে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাকে ১৯৪৬ সালে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভায় একজন মন্ত্রী হিসেবে মনোনীত করেন। সরকারের আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগেন্দ্রনাথ নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রশমনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারত ভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার জন্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সোহরাওয়ার্দী, শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্যদের সমর্থন করেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেনের ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর তিনি পাকিস্তানের পক্ষে তার সমর্থন ব্যক্ত করেন। স্বাধীন পাকিস্তানে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে আইন ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৫০ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তিনি এ পদে আসীন ছিলেন। এ বছরই তিনি পদত্যাগ করেন এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের জন্য দেশত্যাগ করেন। সেখানে তিনি ১৯৬৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

শরৎচন্দ্র বসু ঃ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ৭ সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র বসু কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগণা জিলার কোদালিয়া গ্রাম। আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অগ্রজ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে কলকাতা হাই কোর্টে ওকালতি, ১৯২১-এ কটকে আইন ব্যবসায় শুরু। ১৯২২-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ দল গঠন করলে তিনি তার সংগে যুক্ত হন। ১৯২৪-এ কলকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯৩০-এ চট্টগ্রামে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু হলে আইনজীবী হিসেবে তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। বিচারে বিপ্লবীদের শাস্তি হওয়ার আশঙ্কায় তাদের অস্ত্র সরবরাহ করে কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে সহযোগিতা করেন। বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িত থাকার

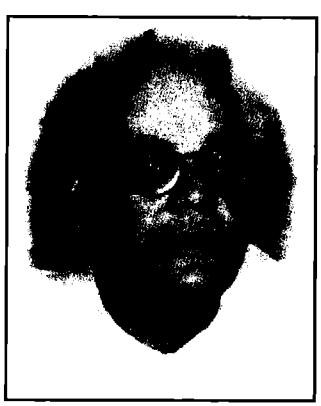

শরৎচন্দ্র বসু

www.pathagar.com

অপরাধে একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭–১৯৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। বংগীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা, কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিরোধী দলের নেতা।

শরৎচন্দ্র বসু ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে অন্তবর্তীকালীন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে সোসালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি (আর. এস. পি.) গঠন করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে নিখিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও বিভক্তি রোধ কমিটি গঠন করেন। তিনি নিজে এই কমিটির সভাপতি ও কামিনী কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কিছুকাল মন্ত্রী পরিষদের সদস্য।

১৯৪৮ সালে তিনি Nation নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্বাধীন ভারতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। বিধান সভায় যোগদানের পূর্বদিন অর্থাৎ ১৯৫০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ড. কিরণ শঙ্কর রায় [১৮৯১-১৯৪৯] ঃ মানিকগঞ্জ জেলার তেওতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী অক্সফোর্ডে তাঁর সহপাঠি ছিলেন। একসময় দেশবন্ধুর শিষ্য তথা সহকর্মী। এবং সুভাষ বসুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৯৩৭ সালে কিরণ শঙ্কর রায় বঙ্গীয় শাসন পরিষদে নির্বাচিত হন। এবং শরৎ বসুর নেতৃত্বে একজন প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এবছর ত্রিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের পর নেতাজী সুভাষ বসুর সাথে তার রাজনৈতিক মতদ্বৈততা দেখা দিলে তিনি গান্ধীর অনুগত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস দলের সাথে যুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে শরৎ বসু গ্রেফতার হলে তিনি বঙ্গীয় লেজিসলেটিড এসেম্বলীতে কংগ্রেসের বিরোধী দলের নেতা নির্বাচিত হন। কিরণ শঙ্কর রায় ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী মানুষ। ১৯৪৬ সালে তিনি কলকাতার দাঙ্গা আক্রান্ত এলাকাসমূহে উল্কার মত ছুটে বেড়িয়েছেন। এবং অগণিত মানুষের জীবন রক্ষা করেছেন। ১৯৪৭ সালে শরৎ বসু ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে তিনি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। কিরণ শঙ্কর রায়

ড. কিরণ শঙ্কর রায়

www.pathagar.com

বরাবরই বাংলা ভাগের বিরোধী ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে থেকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পাকিস্তান গণপরিষদে সংখ্যালঘুদের নেতৃত্বও প্রদান করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ১৯৪৮ সালে দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান এবং পশ্চিমবঙ্গ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আবুল হাশিম [১৯০৫-১৯৭৪] ঃ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাশিয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বর্ধমান থেকে বংগীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বর্ধমান মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে আবুল হাশিম এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ সম্মেলনে (১৯৩৮) এবং ১৯৪০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে তিনি বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সাংগঠনিকভাবে বাংলায় মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনসমূহে মুসলিম লীগের সাফল্য প্রধানত হাশিমের গতিশীল নেতৃত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছিল। হাশিম ছিলেন ১৯৪৭ সালের 'অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার' ব্যর্থ পরিকল্পনার অন্যতম রূপকার।

আবুল হাশিম

দেশ বিভাগের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে যান। হিন্দুরা তাঁর বাড়ী-ঘর পুড়িয়ে দেয়। ১৯৫০ সনে তিনি ঢাকায় চলে আসেন। এখানে এসে আবুল হাশিম খেলাফতে রব্বানী পার্টি গঠন করেন। বাল্যকাল থেকেই তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ ছিল। ১৯৫০ থেকে তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ লোপ পায়।

১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা ইসলামিক একাডেমীর প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এই পদে বহাল ছিলেন। তিনি 'The Creed of Islam', 'As I See it', Arabic Made Easy', 'ফারুকী খেলাফত' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করে অমর হয়ে আছেন। ১৯৭৪ সালে ৭০ বছর বয়সে আবুল হাশিম ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

শেরেবাংলা এ. কে ফজলুল হক ঃ এ. কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় নাজিমুদ্দীনের সাহেবের দল মোটামুটি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। স্বাধীন ও বৃহত্তর বাংলা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শেরেবাংলা একে ফজলুল হক সক্রিয় ভূমিকা পালন না করলেও নেতারা তার সাথে যোগাযোগ করতেন এবং তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন। লাহোর প্রস্তাব অনুসারে তিনি বাংলা ও আসাম নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের সমর্থক ছিলেন।

শেরেবাংলা এ.কে ফজলুল হক

স্যার ফ্রেডারিক বারোজ ঃ বাংলার গভর্ণর ছিলেন। শ্রমিক দলীয় সরকার ১৯৪৬ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে তাকে মি. আর.জি ক্যাসির স্থলাভিষিক্ত করে পাঠান। বারোজ ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রশাসক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সংগে তার অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক ছিল এবং স্থানীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রধানেরও প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন। কোনো ব্যাপারে তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। তিনি বাংলাকে অবিভক্ত রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

www.pathagar.com

লেডী মাউন্টব্যাটেন ঃ লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রী। এক অসাধারণ মহিলা। এডুইনা অ্যাশলে নামে পরিচিত। বিয়ের আগেই মাউন্টব্যাটেনের সংগে তার প্রেম ছিল। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে যখন তিনি ভারতে আসেন তখন তার বয়স ৪৬ বছর। কন্যা পামেলার তথ্য থেকে জানা যায় জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে তার মায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সে কারণে নেহেরু অতি সহজেই এডুইনার মাধ্যমে ভাইসরয়কে প্রভাবিত করতে পারতেন।

হৃদয় উজাড় করা সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি, ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে নেহরু ও লেডি মাউন্টব্যাটেন, পাশে কন্যা পামেলা

www.pathagar.com

জেনারেল ক্লড অখিনকে ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান। তিনি সুশিক্ষিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্বিখন্ডিত করেন।

বলদেব সিং ঃ শিখনেতা। পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পাঞ্জাব দিখন্ডিত করার ফলে ৬ লক্ষ মুসলমান শিখ ও হিন্দু দাঙ্গায় নিহত হয়।

লর্ড ইজমে ঃ লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের স্টাফ অফিসার। তিনি ভারত বিভাগ ও সম্পদ বন্টনে সবিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

আচার্য জে বি কৃপালনী [১৮৮৮] ঃ ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও লেখক। মাতৃভাষা সিন্ধী। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং পরে সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৩ সনে ভারতীয় লোক সভার নির্দলীয় সদস্য ছিলেন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ঃ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখার্জির সুযোগ্য পুত্র। শিক্ষা জীবন থেকেই রামরাজত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি পর পর ৪ বার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে এবং ১৯৪৬ সালেও তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার্ড গ্রাজুয়েটদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরিষদের সদস্য হবার আগেই তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে তিনি শেরেবাংলার মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। ১৯৪২ সালে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে শেরেবাংলাকে মহা বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছিলেন। বস্তুত বাংলা ভাগের ব্যাপারে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকাই সবচেয়ে প্রত্যক্ষ।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বপ্রথম বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের নিমিত্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। তারপর বাংলার বিভিন্ন জেলায় হিন্দুস্বার্থ সংরক্ষণের নামে হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে প্রবল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়। হিন্দু আচার জীবনাভ্যাস সংস্কৃতির উপর শ্যামাপ্রসাদ সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন।

এককালের রাজনীতিবিদ ও রাজবন্দী, ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন প্রার্থী ও সুভাষ বসুর ভক্ত নূরুল ইসলাম চৌধুরীর (জ.১৯০৯) এক

www.pathagar.com

লেখা থেকে জানা যায় ঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ফজলুল হককে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন। শ্যামাপ্রসাদ আসলে অসাম্প্রদায়িক লোক ছিলেন। তার মধ্যে কোনো মুসলিম বিদ্বেষ ছিল না। হৃদয় ছিল উদার। হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন রাজনৈতিক কারণে। যেহেতু তখন কংগ্রেসে প্রবেশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ একরূপ অসম্ভব ছিল সুভাষ বসু ও শরৎ বসুর দাপটে। তিনি উদারনৈতিক মানবিক গুণসম্পন্ন লোক ছিলেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর তিনি নেহেরু মন্ত্রীসভায় শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন। নীতি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় ১৯৫০ সালের ১৯ এপ্রিল তিনি পদত্যাগ করেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ১৯৪৯ সালে হিন্দু মহাসভার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৯৫১ খৃস্টাব্দে তিনি জনসংঘ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এই দলের সভাপতি হন। ১৯৫২ সালে দক্ষিণ কলকাতা থেকে তিনি পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতারূপে তার অসাধারণ বক্তৃতাবলী সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভিপি মেনন ঃ ভিপি মেনন ছিলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের রিফর্ম কমিশনার ও প্রধান উপদেষ্টা। মেনন তার বিভিন্ন কার্যাবলীর মাধ্যমে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের ওপর বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেন। মেনন ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের সংগে আলোচনা করেন এবং ভারতের ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে তিনি প্যাটেলকে রাজি করান। তিনি ৩রা জুনের ক্ষমতা হস্তান্তরের দলিল প্রণয়ন করেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ [১৮৬৮-১৯৬৮] ঃ রাজনীতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে তিনি দেশ ও জাতির সপক্ষে রাজত্ব করেছেন। একটি সাপ্তাহিক ও চারটি দৈনিকের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্যবাদী দমননীতির মাধ্যমে একটি কাগজের কণ্ঠরোধ করা হলে প্রায় রাতারাতি তিনি আরেকটি কাগজ বের করেছেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক জামানা, দৈনিক সেবক এবং সবশেষে দৈনিক আজাদ তার জাগ্রত সাংবাদিক চেতনারই ফসল।

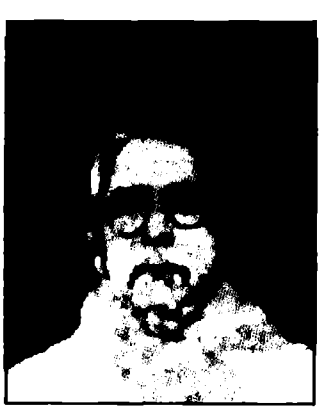

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

www.pathagar.com

বাংলা গদ্য সাহিত্যেও মওলানা আকরম খাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তার বিপুলায়তন গ্রন্থ মোস্তফা চরিত, মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, সমস্যা ও সমাধান, কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসির তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ও প্রজ্ঞার প্রামাণ্য দলিল।

বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সভাপতি এবং ১৯৪৭ সন পর্যন্ত মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রথমে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবী করলেও পরে তিনি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিপক্ষে চলে যান।

লর্ড ওয়াভেল ঃ লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৩ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল ছিলেন। জওহরলাল নেহেরু ছিলেন ওয়াভেলের ছাত্র জীবনের বন্ধু।

খাজা নাজিমুদ্দিন [১৮৯৪–১৯৬৪] ঃ ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর ভাগ্নে। তাঁর পিতার নাম খাজা নিজাম উদ্দিন। খাজা নাজিমুদ্দিন আলীগড়, ডানস্টাবল

খাজা নাজিমুদ্দিন

গ্রামার স্কুল ও ক্যামব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন ও পরে লিঙ্কস ইন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। তিনি ছিলেন স্পোর্টসম্যান ও ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়। ১৯২৯ সালে তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষামন্ত্রী হন। ১৯৩৭ সালে ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৩ সালে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য এবং মি. জিন্নাহর অনুগত। ১৯৪৭ সালে স্বাধীন বৃহত্তর বাংলা দাবী করলেও পরে মূলদাবী থেকে দূরে সরে যান। তিনি বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত করার পক্ষে দাবী তুলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টি হলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৮ সালে জিন্নাহর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল এবং ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে পদচ্যুত করেন।

১৯৬৪ সালের ২২ অক্টোবর ৭০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

নূরুল আমিন ঃ ১৯৪৪-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৪৫-এর নির্বাচনে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচীত হন এবং অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ আইন সভার স্পীকার। পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তিনি খাজা নাজিমুদ্দিনের পূর্ব বাংলা মন্ত্রীসভায় বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী ছিলেন। নূরুল আমিন ১৯৪৮ সালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করেন এবং তাঁরই সময়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ছাত্র-জনতার মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে ৪ জন শহীদ হন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন।

নূরুল আমিন

নূরুল আমিন ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে (এনডিএফ) যোগ দেন এবং আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসন বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর তিনি ফ্রন্টের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে নূরুল আমিন জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন এবং এ দলের সভাপতি হন। ১৯৭০ সালে তিনি জাতীয় পারিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং পাক-হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন এবং স্বাধীনতার পর পরই পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। নূরুল আমিন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২ অক্টোবর তিনি রাওয়াল পিন্ডিতে মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

বাংলা বিভাগের ঐতিহাসিক মুল্যায়ন

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মূল বাংলাদেশ ভূখন্ডের মানুষেরই স্বজাতি,। ১৯৪৬-৪৭ এর পরিস্থিতি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিল বাঙালি পরিচয় বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় নাগরিক বনে যেতে। ১৯৪৭ সালে যা ঘটেছে তা ছিল ইতিহাসের নির্মম ট্রাজেডী, জাতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ নয়।

কেননা কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ এই ত্রিশক্তির শীর্ষ নেতৃত্ব বাঙালির হাতে ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের শীর্ষ নেতৃত্ব ছিল যথাক্রমে নেহরু ও জিন্নার হাতে এবং মূলতঃ অবাঙালিদের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত। যে শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তান ও ভারতের সৃষ্টি সে অবস্থায় বিবেকবান মানুষের সুস্থ চিন্তার কোন অবকাশ ছিল না। প্রায় সকলেই একটা সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন কিছু সময়ের জন্য। মানবিক যুক্তির চেয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও প্রতিহিংসাজাত পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না ছিল বেশি শক্তিশালী–অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য।

বাংলা ভাগের অব্যবহিত পরেই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে থাকে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে তাদের এই যাওয়া অব্যাহত থাকে। পশ্চিমবঙ্গে এরা পরিচিতি লাভ করে ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু, রিফিউজি হিসেবে। 'বাঙাল' নামেও এদের অবজ্ঞা করা হয়। শিয়ালদহ স্টেশনে, ট্রানজিট ক্যাম্পে এরা মানবেতর জীবন যাপন করতে শুরু করে। অনাহারে অসুখে অনেকের মৃত্যু হয়। সাহিত্যিক অতুল পাল এদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেনঃ- (১) **সম্পন্ন শ্রেণী**– যাদের দেশ বিভাগের পূর্বেই পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাসের সঙ্গতি ছিল। (২) **শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী**– যারা তাদের সামর্থ্যের জোরে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে চাকুরী, ছোট ব্যবসা বা অন্যভাবে মোটামুটিভাবে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। (৩) **তৃতীয় শ্রেণীর বাঙালি**– যাদের, সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। তারাই ট্রানজিট, ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় পেয়েছিল। ১৯৪৯ এর শেষ দিকে ক্যাম্পের উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০ হাজারে। এদের অধিকাংশই ছিল মহিলা ও শিশু। ভারতের কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর পরিসংখ্যান অনুযায়ী "১৯৫০ এর প্রথম থেকে ৫৩ দিনের মধ্যে ৫৬,০০০, ২৩ ফেব্রুয়ারী থেকে ৮ মার্চের মধ্যে ৯৮,৪৬০ উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এই বছরের প্রথম তিন মাসে আসে দেড়লক্ষ উদ্বাস্তু। ১৯৫০ এর শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২১ লক্ষে পৌঁছে যায়।" এই উদ্বাস্তু প্রবাহ চলতেই থাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে। তখন

www.pathagar.com

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রায় কিছুই করেনি। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের পশ্চিমপাঞ্জাব থেকে আসা অবাঙালি শিখ উদ্বাস্তুদের জন্য প্রায় সবকিছুই করে। কারণ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারে অবাঙালির প্রাধান্য সুস্পষ্ট। কাজেই যে বাঙালি হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করেছিল তারা সত্যিকার অর্থেই দুর্ভাগ্য ছিল। তারা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারাও অবহেলিত হয়েছিল। অবাঙালি হলে তারা অবশ্যই সুন্দরভাবে পুনর্বাসিত হতো। ঋত্বিক ঘটকের বিখ্যাত ছবি 'সুবর্ণ রেখায়' এ ধরনের কিছু ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিন্দু বাঙালির পরিবারের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এপার ওপার কোথাও কোন ঠাঁই নেই এদের– নেই কোন আশ্রয় বা ভরসা। শুরু হয় জবর দখল আন্দোলন। সোদপুরের দেশবন্ধু কলোনী, বিজয়গড়, রামগড় প্রভৃতি স্থানে উদ্বাস্তু কলোনি গড়ে ওঠে। কোথাও কোথাও ফাঁকা বাড়ি ও ব্যক্তিগত জমি দখল হতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে পশ্চিমবঙ্গে এত বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর জায়গা হবে না। সুতরাং উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্যান্য প্রদেশে পাঠান হবে। বিশেষত দন্ডকারণ্যে ও আন্দামানে। তৎকালীন শাসকদলের আশংকা লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী হিন্দু যদি পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বসতি পায় তাহলে তাদের ভোট ব্যাঙ্কের এক সংখ্যাগত পরিবর্তন হবে। সেই কারণে সংহত বাঙালি শক্তিকে তারা বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইল। অন্যদিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ইউ.সি. আর সি এবং অন্যান্য উদ্বাস্তু সংস্থাগুলির দাবী ছিল সম্মতি ছাড়া কোনো উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠানো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের উদ্ধারযোগ্য পতিত জমিতে তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে জানান হয় কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কোন উদ্বৃত্ত কৃষি জমি নেই। ১৯৫৮-৫৯ সাল জুড়ে চলে উদ্বাস্তুদের সত্যাগ্রহ আইন অমান্য, মিছিল মিটিং। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন ব্যর্থ বলা চলে। আশ্রয়হীন ছিন্নমূল বাঙাল মানুষেরা বুঝে গেল তাদের আন্দামানে দন্ডকারণ্যে যাওয়াই উচিত হবে। পরবর্তীকালে সরকারের নির্দিষ্ট স্থানে বাঙালরা গিয়ে গহীন জঙ্গল কেটে ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছে, শক্তমাটিকে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত করেছে, নিজেদের শ্রমে নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে।

তপন রায় চৌধুরী কলকাতা থেকে প্রকাশিত ২ জুলাই, ২০০৬ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'বাঙালনামা' প্রবন্ধে বলেন, 'বঙ্গভঙ্গ হয়ে উভয় বঙ্গে সব সম্প্রদায়ের বাঙালিরই সর্বনাশ ঘটেছিল, এটা আমার স্থির বিশ্বাস। ইতিহাসের সেই রদবদল করার ক্ষমতা আমাদের নেই। ভারত বিভাগের এবং বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত যখন কঠিন সত্য বলে মেনে নিতে হল, তখন পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দু সবাই যে ঠিক মাথায় হাত

www.pathagar.com

দিয়ে বসে, তা নয়। তাদের জীবনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে এটা বোধ হয় প্রায় সবাই বুঝতে পেরেছিল। অনেকেই পশ্চিমবঙ্গে একটা মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজতে শুরু করে, কিন্তু ওই চেষ্টার পথ সহজ ছিল না। প্রথম কথা, হঠাৎ অন্য জায়গায় গিয়ে বাড়িঘর কিনে বসতি করার সামর্থ্য অল্প লোকেরই ছিল। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত বাঙালি চাকরিজীবী। মধ্য বয়সে নতুন জায়গায় গিয়ে চাকরি খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমে উদ্বাস্তুর ঢল্ নামার সময়ানুক্রমিক হিসাব কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণা যে, ঢলটা নামে দেশ বিভাগের পর, আগে নয়। এ ধারণা ভুল হতে পারে। সম্ভবত কলকাতার দাঙ্গার পর থেকেই কিছু মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পালাবার পথ খুঁজছিলেন। বাড়ির দাম এবং বাড়ি ভাড়া দুই-ই আকাশচুম্বী হওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ায় সে চেষ্টা সফল হওয়া সহজ ছিল না। অনেকে এসে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ওঠেন। সে অভিজ্ঞতা কারও পক্ষেই সুখের হয়েছিল বলে মনে হয় না।'

১৯৪৭ সালে বাংলা বিভাগের সময় পূর্ববাংলার জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ। এর মধ্যে মুসলমান আড়াই কোটি, হিন্দু দেড় কোটি। হিন্দুরা জমি জমা বাড়ি-ঘর পানির দরে বিক্রি করে হিন্দুস্তানে যেতে লাগলো। জন্মভূমি ত্যাগ করে একটি ভূখন্ডে যাওয়া যে কত কঠিন হিন্দুদের এই যে যাওয়া শুরু হয়েছে সেই যাওয়া আজও বন্ধ হয়নি। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে হয়– সংখ্যালঘুরা সব সময়ই সংখ্যাগরিষ্ঠকে ভয়ের চোখে দেখে থাকে। এই হীন্যমন্যতা বোধ থেকেই হয়ত তারা আজও দেশ ত্যাগ করছে। আমি দেখেছি পশ্চিম বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, বস্তি এলাকায়, কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় বাংলাদেশের মানুষের করুণ অবস্থা। যদি ৪৭ সালে অখন্ড বাংলা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হতো তা হলে বাঙালি হিন্দুদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতো না। যুগ যুগ ধরে বাঙালি হিন্দু মুসলমান বাংলাদেশে একত্রে বসবাস করেছে, তাদের মধ্যে একটি আত্মার সম্পর্ক ছিল। তারা নিজেরাই মিলে মিশে বাংলা শাসন করতো। পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গে হিজরত করার প্রয়োজন পড়তো না। রাজনীতিকদের দূরদর্শিতার অভাবেই মানুষ কষ্ট করেছে। বিশেষ করে কতিপয় হিন্দু রাজনীতিবীদ এজন্য দায়ী। তাদের ভূল সিদ্ধান্তের কারণে লক্ষ লক্ষ বাঙালি দুঃখ দুর্দশার শিকার হয়েছে। একটি ভুখন্ডের লোকেরা কখনও অন্য ভুখন্ডের মানুষকে পছন্দ করে না। আমাদের দেশ থেকে এক সময় অসংখ্য বাঙালি আসামে গিয়েছিল। আসাম ছিল বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ একটি অনুন্নত জনপদ। বাঙালিরাই সেখানে বন জঙ্গল কেটে জমি চাষবাস করেছে, আসামের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেছে। কিন্তু বাঙালিরাই সেখানে থাকতে পারেনি। সেখানে বাঙাল খেদাও আন্দোলন হয়েছে। পাকিস্তান

www.pathagar.com

হওয়ার পর যে সকল হিন্দু ত্রিপুরা আসাম পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছে তাদেরকে নতুন করে জীবন গড়তে হয়েছে। অনেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেকে ছিন্নমূলে পরিণত হয়েছে।

ত্রিপুরা ও গোয়াহাটিতে অসংখ্য মানুষ উপজাতিদের হাতে জীবন দিয়েছে। ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাগত বাঙালিদের ভারতের বিহার, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থান, দিল্লী, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পুনর্বাসন করেছে। পুনর্বাসিত বাঙালিরা তাদের বাঙালিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। বাঙালিরা জন্মভূমির কথা মনে করে আজও চোখের পানি ফেলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের মানুষেরা মনে করে তাদের পূর্বপুরুষ অর্থাৎ বাপদাদাদের বাড়ী ছিল এক সময় বাংলাদেশে। পশ্চিম বাংলা থেকে অনেক মানুষ বাংলাদেশে বেড়াতে আসে। বাপদাদার জন্মভিটার এক মুঠো মাটি গামছায় বেধে পশ্চিমবঙ্গে নিয়ে যায়। জন্মভূমির মাটিকে তারা পবিত্র মনে করে।

স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বাঙলা বিভাগ সম্পর্কে স্যার র‍্যাডক্লিফকে বলেছিলেন, "আপনি যখন প্রদেশটি খণ্ডিত করবেন, তখন দু'টি জিনিস ঘটবে। প্রথমত, বাঙলা বিভাগের ফলে এখানে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা সংঘটিত হবে এবং দ্বিতীয়ত, পূর্ব বাংলা গ্রাম্য বস্তিতে পরিণত হবে।" স্যার ফ্রেডারিক বারোজের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি সত্যে পরিণত হয়েছিল এবং এটা হওয়ার পেছনে সুস্পষ্ট কারণও ছিল। পূর্ব বাংলা ছিল সবসময় কলকাতার পশ্চাদভূমি। এ অঞ্চলটি কলকাতার জন্য খাদ্য ও পাট জন্মাতো। কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলা কলকাতার সাবেক বাজার হারিয়ে ফেলে এবং কলকাতা বন্দরের সুযোগ-সুবিধা থেকেও সে চিরদিনের মতো বঞ্চিত হয়।

ভারত থেকে ২০ লক্ষ শরণার্থী পূর্ববাংলায় আশ্রয় নেয়। মানুষের বসতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই শরণার্থীদের অধিকাংশই ছিল বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোক। ১৯৪৬ সালে বিহারে যে সাম্প্রতিক দাঙ্গা হয় তাতে বিহারী মুসলমানরা হিন্দুদের দ্বারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বহু জান-মালের ক্ষতি হয়। দেশভাগের পর তারা বাংলাদেশের সৈয়দপুর, ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম এবং নারায়ণগঞ্জে ব্যাপকহারে বসতি স্থাপন করে। পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে শরণার্থীদের বসবাস শুরু করার সময় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এ অঞ্চলে বেশ কিছু শিল্প উদ্যোক্তার আগমন ঘটে। আমলা ও সামরিক বাহিনীর সদস্যদের অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানি। ভাষার প্রশ্ন নিয়েও অতিরিক্ত জটিলতা দেখা দেয়। এসব কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিরোধের এক নতুন পর্যায় সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য জাতিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভক্ত করে ফেলে। বাঙালিরা নিজেদের একটি স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় গড়ে তোলে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তারা বাঙালি জাতিয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয় এবং পরিণতিতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। একটি শসস্ত্র সংগ্রামের মধ্যদিয়ে

www.pathagar.com

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৪৭-এ যা ঘটেছে তার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা চিরতরে উপমহাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। একটি ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তা হিসাবে তার স্বকীয়তা রক্ষার জন্য তাদের আপ্রাণ লড়তে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গকে আজ হিন্দিভাষী ভারতের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের থাবার নিচে স্বকীয়তা বিসর্জন দিতে হচ্ছে। একদা যে পশ্চিমবঙ্গ উপমহাদেশের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে আজ তার অবস্থান ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে।

এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতিহাসের বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটবে কিনা তার আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাইনে। তা ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। তবে একথা বলতে চাই ঃ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি প্রদেশ। ভারতের বৃহত্তর সংস্কৃতির সে অংশীদার। তবু পশ্চিমবঙ্গ যেন তার বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য না হারায়, সে ক্ষেত্রে সকল বাঙালি যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে। আত্ম-সংস্কৃতিকে সংস্থিত থেকে সে যেন ধারণ করে রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাত্মবোধ।

আর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেখানে অন্তর্গত সাংস্কৃতিক বৈপরীত্য তাকে বিভেদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। তাই ধর্মীয় বা আঞ্চলিক কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব না দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধে শিলীভূত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ চিন্তাকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ থেকে বিচ্যুতি হবে আত্মঘাতী।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে নিজস্ব সংস্কৃতিকে বজায় রেখেই গ্রহণ করতে হবে বিশ্বের সওগাত। দুই দেশের দুই বাংলার বাঙালি অবগাহন করবে একে অন্যের সাংস্কৃতিক স্রোতধারায়। একই সঙ্গে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে হবে একে অন্যের সহযোগী। অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সুবিধে বিবেচনায় রাখতে হবে। চলবে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়। এভাবেই রুখে দিতে হবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিভেদের ষড়যন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা। আবার একই সাথে বৈশ্বিক পটভূমিতেও উভয় রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ হবে আপন সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাকে প্রমুক্ত রেখে বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক সম্পদকে প্রয়োজনে আত্মীকৃত করে চলতে হবে সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের পথে।

www.pathagar.com

১। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২৭ এপ্রিল ১৯৪৭

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা প্রতিষ্ঠার পক্ষে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।	মর্নিং নিউজ, ২৮শে এপ্রিল ১৯৪৭ সূত্রঃ শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১।	২৭ এপ্রিল ১৯৪৭।

Extracts from the press Statement of H. S. Suhrawardy, Chief Minister, in New Delhi, 27 April 1947.

It must be a matter of greatest regret to all those who were eagerly looking forward to the welfare and prosperity of Bengal to find that an agitation for its partition is being vigorously pursued in some quarters. This cry would never have been raised had it not been due to a sense of frustration and impatience on the part of some Hindus in as much as the members of their community have not an adequate share in the Bengal Ministry in spite of their numbers in the province, their wealth, influence. education, participation in the administration of the province, their propaganda and their inherent strength.

This frustration is largely the result of a failure to realise that the present conditions in Bengal are not applicable to an independent sovereign state as I hope Bengal will be. Today we are in the midst of a struggle in India between contending factions of all-India importance each intent on enforcing its views on the other and neither willing to give way except at a price which the other is not prepared to pay.

Their disputes profoundly affect the politics of all the provinces and the problems are being treated as a whole. An entirely different state of circumstances will arise when each province will have to look after itself and when each province is sure to get practical, if not total, independence, and the people of Bengal will have to rely upon each other.

It is unbelievable that under such a set of circumstances there can exist a Ministry in Bengal which will not be composed

www.pathagar.com

of all the important elements of its society or which can be a communal party Ministry or where the various sections will not be better represented than they are now. I do not think that the fact that the Muslims will have a slight preponderance in the Ministry by virtue of their slender majority will be grudged by the Hindus as indeed this has hitherto been accepted by all as inherent in the nature of things in Bengal.

I have read the most fervid fulminations against the government of Bengal on its alleged treatment of the Hindu population. These denunciations have been built on the most slender and imaginary foundations. I by no means admit that the demand for the partition of Bengal is the demand of the majority of the Hindus even of West Bengal, let alone of the majority of the Hindus of Bengal.

The ties and culture of the Hindus of every part of Bengal are so much the same that it is not even to the advantage of the Hindus of one part of Bengal to sever those ties in the hope of grasping power.

Indeed by the same analogy the wishes of all the people of Bengal Muslims, Hindus and Scheduled Castes and others ought to be ascertained on the question of partition of Bengal which can only be undertaken if there is a substantial majority in its favour. It is these fundamental factors peculiar to Bengal which differentiate the question of partition of Bengal from the Muslim damand for the division of India, apart from such factors as economic integrity, mutual reliance and the necessity of creating a strong workable state.

The lead of partition has been taken by the Hindu Mahasabha which hopes that by whipping up agitation for the partition of Bengal, for the dismissal of the Bengal Ministry, imposition of sec : 93, establishment of regional Ministries, by arousing fanaticism against the Muslims of Bengal, by creating disturbances through hartals and violence, they will be able to ingratiate themselves with the Hindu people and destroy the influence of the Congress. The Hindu Mahasabha wishes to

www.pathagar.com

stage a comeback, so do sundry politicians who have not been able to find an inch for themselves.

★ ★ ★ ★

But let us once more consider the validity of the demand itself. Why should the Bengalee Hindus demand a separate homeland?

Let me proceed on the assumption for the time being that the demand is not limited to a few but is put forward by all caste Hindus, Scheduled Caste and those who have not returned their castes. Nor has their culture, their religion, their language suffered under the present regime and how do they thing that in a future set-up they will suffer so that they can only flourish and safeguard their culture and life if they have a small portion of Western Bengal. To my mind, I think the demand is suicidal from the point of view of the Hindus. Even if it did happen, an eventuality which I cannot conceive, that the rule passed solely into the hands of Muslims, and attitude which would combine the entire population of Hindus in opposition to Muslims, could such a policy possibly succeed or be put into effect, where any Government of Bengal would have to carry its own servants along with it and most of them belong to the Hindu community? Then again the industry, business, the professions are in their hands. Their youths are well-advanced and know their rights and know to achieve their claims. Not only is the present attitude due to sense of impatience, frustration not only is it short-sighted but is a confession of a defeatism which one hardly expected from the great Hindu Community of Bengal.

Noakhali is constantly cited as an indication of what might happen in the future set-up of an independent state. I have already said that it would be ridiculus to draw conclusions for the future from the present set-up but let us pause here for a moment. Can Noakhali and the incident of that area be considered typical and an augury for the future, and are there not many other districts where the Muslims are in a convincing and overwhelming majority and yet has not peace been preserved in

www.pathagar.com

those districts and has not the Hindus carried on exactly as before with all their powers and privileges?

And let us pause for a moment to consider what Bengal can be if it remains united. It will be a great country, indeed the richest and the most prosperous in India capable of giving to its people a high standard of living where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will truly be plentiful. It will be rich in agriculture, rich in industry and commerce and in course of time it will be one of the most powerful and progressive states of the world. If Bengal remains united this will be no dream, no fantasy. Anyone who can see what her resoureces are and the present state of its development will agree that this, must come to pass if we ourselves do not commit suicide.

I have visualised all along, therefore, Bengal as an independent state and not part of any union of India. Once such states are formed, their future rests with them. I shall never forget how long it took for the Government of India to realise the famine conditions in Bengal in the year 1943, how in Bengal's dire need it was denied foodgrains by the neighbouring province of Bihar, how since then every single province of India has closed its doors, and deprived Bengal of its normal necessities, how in the councils of India Bengal is relegated to an undignified corner while other provinces wield undue influence.

No, if Bengal is to be great, it can only be so if it stands on its own legs and all combine to make it great. It must be master of its own resources and riches and its own destiny. It must cease to be exploited by others and shall not continue to suffer any longer for the benefit of the rest of India ..... To those, therefore, of the Hindus who talk so lightly of the partition of Bengal, I make an appeal to drop this movement so fraught with unending mischief. Surely, some method of government can be evolved by all, of us sitting together which will satisfy all sections of the people and revivify the splendour and glory that was Bengal's.

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পক্ষে বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক জনাব আবুল হাশিমের প্রেস বিজ্ঞপ্তি।	মর্নিং নিউজ, ২৯শে এপ্রিল ১৯৪৭ সূত্রঃ শীলা সেন, মুসলিম পলিটিক্স ইন বেংগল। পৃষ্ঠা-২৮১।	২৯ এপ্রিল ১৯৪৭।

The press statement of Abul Hashim, Secretary, Bengal Provincial Muslim League, Calcutta, 29 April 1947.

Time has come when truth must be told. Surrendering to vulgar thinking for cheap popularity and opportunist leadership is intellectual prostitution. Only around 1905 Bengal was the thought-leader of India and successfully challange the might of the then British Government. It is a pity that Bengal today is intellectually bankrupt and is begging and borrowing thought and guidance from alien heroes. I wonder what has happened to the Hindus of Bengal who produced men like Surendranath Banerjee, Rabindranath Tagore, Ashutosh Mukherjee, Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose.

The present revolutionary thinking of India owes its birth to Bengal. True revolution does not lie in intermecine killing but in creating revolution in thinking and feeling Bengal must shake off her inferiority complex and defeatist mentality. revert to her past traditions, rise again to the heights of her genuine and would her destiny, Sentiments and emotions have no place in serious thinking. Temporary insanity should not be allowed to influence our future decisions.

Bengal today is standing at the cross roads–one leading to freedom and glory and the other to eternal bondage and abounding disgrace, Bengal must make a decision here and now. There is a tide in the affairs of men which taken at the floods leads on to fortune. Opportunity once lost may come no

www.pathagar.com

more.

Cent per cent alien capital, both Indian and Anglo-American, exploiting Bengal is invested in West Bengal. The growing socialist tendencies amongst us have created fears of expropriation in the minds of our alien exploiters. They have the prudence to visualise difficulties in a free and united Bengal. It is in the interest of the alien capital that Bengal should be divided, crippled and incapacitated so that neither part there of may have strength enough to resist it in future.

From the nature of the communal disturbances in Bengal I am of the opinion that these are being engineered and encouraged by Anglo-Indian vested interests and their Indian alies. In the ordinary course of business respectable and reliable parties find it difficult to secure licence for fire arms. But immense quantities of dangerous weapons of British and American origin, left over in India, are being lavishly distributed among the Hindu and Muslim hooligans, conscious and unconscious agents of the partition of Bengal. A big gun of Bengal, who has developed an obnoxious craze for the Premiership of Bengal, once remarked to me that since he has no future and his everything was past, he has thus justified his opportunism. Fossils of Bengal may find immediate gain in her partition but what has happened to her youth, whose entire destiny lies in the future? Are the going to barter away their future for the benefit of handful of careerists placed at a position of vantage by circumstances?

Partition of Bengal bears no analogy to the partition of India. The lamentsble perversion in thinking which suggests that the movement for the partition of Bengal is convenient counterblast to Pakistan arises out of a colossal ignorance of the contents and implications of the Lahore Resolution to which and which alone and not this or that interpretation there of, Muslims of India owe allegiance. That resolution never contemplated the creation of any 'Akhand' Muslim State or any artificial Muslim majority

www.pathagar.com

either by forable importation of alien elements as is being done in Palestine or by any mass transference of population as was done between Turkey and Greece.

It rarely demanded complete sovereignty for those countries which are known to the world as Muslim majority countries, and by implication demands complete sovereignty and self-determination of all the nations and countries of India. It gives Bengal and other cultural units of India complet sovereignty while keeping open the possibility of creating and international (sic) purely on a voluntary basis for the benefit of all.

Pakistan never postulates that in Bengal or the Punjab Muslims shall be the ruling race and others reduced to the status of a subject nation. Quaid-e-Azam after the failure of Jinnah-Gandhi talks at Bombay had diclared in clear and unequivocal terms that free Pakistan states shall be governed and administered by the will and consent of the entire people on the basis of universal adult suffrage. I will like to add by system of joint electorate if the minorities do not demand separate electorate for their own protection.

In the absence of outstanding leadership the country is being rack rented by vulgar fortune-hunters. Youths of Bengal. both Hindu and Muslim, must unite, liberate their country from the shackles of extraneous influence and make a bid for regaining Bengal's lost prestige and an honourable place in the future comity of nations, both of India and the world, Let the youths of Bengal build their character from their past traditions and derive inspirations for their present struggle from the glories of the future.

Hindus and Muslims of Bengal, preserving their respective entities, had by their joint efforts, in perfect harmony with the nature and climatic influence of their soil, developed a wonderful common culture and tradition which compare favourably with the contribution of any nation of the world in the evolution

www.pathagar.com

of man.

In the free state of Bengal, Hindus and Muslims as such shall have no right exclusively reserved for them except the right of Muslims to govern their society according to their own "shariat" and the right of the Hindus to govern their own society according to their "Sastras." These rights give the Muslims their spiritual need for Pakistan and the Hindus a real homeland for the free development of their own ideology and material realisation of their particular outlook on life. It is unthinkable that in free Bengal, the Hindus of Bengal who consitute nearly half of its population will be denied their legitimate share in administration and in the enjoyment of her material resources. Hindu-Muslim population of Bengal is almost balanced. Neither community is in a position to dominate the other. If Bengal is permitted to harness all her resources for the exclusive service of the children of her soil, both Hindus and Muslims shall be happy and prosperous for many a century come.

But in a divided Bengal, West Bengal is bound to be treated as far-flung province, possibly colony, of alien Indian imperialism. However high they may pitch their expectation on partition, it is crystal clear to me that the Hindus of Bengal shall be reduced to the status of daily wage-earner of an alien capitalism.

It will be a tragic mistake to visualise the future in the context of the vicious present bondage and slavery, Hindus of Bengal have developed a suspicious complex from 10 years of one party Muslim Ministry in Bengal. But it must be told to all fairness that neither the Bengal nor the All India Muslim League ever stood in the way of coalition with the real legislature made persistent efforts to effect such a coalition but failed in the attempt due to the interference of the Congress High Command. Mr, Suhrawardy before the formation of his ministry made honest efforts to secure the co-operation of the Congress.

I distinctly remember that Mr. Gandhi in course of his talks

www.pathagar.com

with us at 40, Theater Road, on the eve of his departure for Noakhali, had said "I am not enamoured of coalition. I believe in one party government. Therefore, I do not insist on coalition in Bengal. I might mention here that Bengal was then the only place which had a Muslim ministry. Any coalition here would have envisaged coalition ministries in the rest of India. Thus Hindu-Bengal was left in the lurch as were Muslim league elsewhere.

Hindus and Muslims of Bengal left to themselves and freed from the menace of Indianism can settle their affairs peacefully and happily. Unfortunately, the paramount interests of Muslim parliamentarians have always been in shufling the ministry like a pack of cards. They could hardly concentrate on any policy and programme good, bad of indifferent.

I am unfortunate in as much as I fail to appreciate what is there in the wretched ministry under the Act of 1935. Since, reasonably or otherwise there is a suspicion on the part of the Hindus against them, it is now upto Muslims to clear the deck and convince them, not merely by sermons and press statements but by action that they do not mean to be unfair to them. The present unrest perverse thinking and suicidal moves constitute a disease of the social organism. Intense patriotism for the creaton of a united and sovereign Bengal having all the attributes of an independent country, is the remedy and not partition.

Mr. C. R. Das is dead. Let his spirit help us in moulding our glorious future. Let the Hindus and Muslims of Bengal agree to his formula of 50 : 50 enjoyment of political power and economic privileges. I again appeal to the youths of Bengal in the name of her past traditions and glorious future to unite, make a determined effort to dismiss all reactionary thinking and save Bengal from the impending calamity.

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
হিন্দু মহাসভা কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধাচরণের জবাবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।	লুক ইন্টু দি মিরর ঃ সিরাজুদ্দিন হোসেন, পৃষ্ঠা ৯৫।	৮ মে, ১৯৪৭

[Text of H. S. Suhrawardy's rejoinder to criticism of his move for United Independent Bengal by Hindu Mahasabhites and others. Published in the press on May 8, 1947].

Mr. Shyama Prasad Mukherjee and various other leaders have come out with rejoinders to my plea for a united sovereign Bengal. In the rejoinders one senses a great deal of suspicion and distrust of Muslims and a great deal of hope that in one portion at least of Bengal the Hindus will be so overwhelmingly large in number that they will be able to dominate over Muslim minority.

Petty Show

This dream appears to have dazzled them into driving away all sane logic, all desire for compromise and co-operation with Muslims. They seem unable to realise how their Bengal will be a petty little show that will be accorded a backseat in the councils of their divided India.

Mr. Shyma Prasad Mukhejee has in particular unburdened himself in violent language and hyperbolic abuses. By constant reiteration of what he designates as to helpless position of the Hindus in Bengal, Mr. Mukherjee will like to convince the world at large and not the least himself that the Hindus in Bengal are really unfortunates if Bengal remains united.

He even likens the position of the Hindus in Bengal to a hell, a hell, however, so privileged, so replete with wealth, power and influence, that the Muslims consider it their aims and ambition and would deem themselves unfortunate if they could but dwell in a semblance of it.

www.pathagar.com

Hard words

What is the use of hard words and vituperations? What is the use of vilifying me, attacking my bonafides, expatiating on my sins of omissin and commission and holding me responsible for all the ills in Bengal? They cannot after the nature of things, but merely excite the passions of persons who have been taught' to imbibe readily abuse and hatred of the Muslims and to believe the worst of every Muslim.

He had those who think like him have absolutely overlooked the irrefutable fact that the future independent Bengal which willl not rely either on the 1935 Act or on any extraneous power but will have to rely on the willing co-operation of the people particularly of a people so dominantly situated as the Hindus are the province cannot but have different politics. What have the alleged short comings of the present government or ministry. what have even my own position and individulity to do with what the people of Bengal can achieve if they remain united and co-operate with each other?

Short-sighted View

It is not I who is offering them anything; it is for the people of Bengal to make and transmute their destiny buy remaining together. It is a very short-sighted view to adopt the present, with its tremendous limitations as a guide to the shape of things to come in Independent Bengal.

Further, cannot Mr. Mukherjee visualise that there is a vast difference between the problem of Bengal and of India; that because Bengaless are one race and have one language and have many points in common and are capable of understanding each other, and working for the common good, it does not follow that persons living within the sub-continent of India also belong to one race, speak the same language, have the same interests or even have the same history? In India, as well as in most of the provinces the Hindus are in a considerable majority, whereas in

www.pathagar.com

Bengal the majority margin of the Muslims is narrow and will be narrower still in greater Bengal.

The Hindus of Bengal by virtue of their position and their status and thier numbers hardly stand in need of any protection or safeguards, whereas in India the Muslims with thier inferiority in numbers and resources do stand in need of such protection as is given by a partition. In Bengal the Hindus have their own language, their culture, their system of education and a free exercise of their religion. In India the language of the Muslims is being tampered with, their literature is being distorted, their education is being affected and in place after place laws have been framed which prohibit the full and free exercise of their religion.

Big share for Hindus

In India and in most of the provinces the Muslims will have a negligible share if any at all, in the administration but in Bengal the share of the Hindus is bound to be considerable and about equal to the share of the Muslims. Hence if there is a partition of India for the purpose of giving protection to the Muslims of India, it does not follow that there should be a partition of Bengal for the purpose of giving protection to the Hindus of Bengal.

I need not stress these obvious differences any further. Mr. Mukherjee is of opinion that two areas predominantly Hindu on the one hand and predominantly Muslim on the other are a solution. Far from being a solution this overwhelming predominance will give rise to a sense of submission, which will retard the growth of the moral stature of the minority and after their very culture and mode of life.

Is not the alternative which I propose, namely, complete cooperation which is bound to exist where the majority and minority communities are almost equal in number and where the

www.pathagar.com

influence of the minority community. balances its minority status, as in an undivided Bengal, is not this far better than a sense of repression brought about in the minorities of the two sections? There can be no one party rule under the scheme which I propose. The desire that the Bengal state should be linked to the centre seems to have been prompted by the belief that if it is linked to the centre, which will be predominantly Hindu the Life and liberty and culture of the Hindus of Bengal will be saved, otherwise they will perish in a united Bengal.

Moral weakness

Is this not a doctrine of defeatism and a confession of a terrible moral weakness that the Hindus of Bengal should stand in need of protection from a loose centre?

I ask them, is domination possible any more anywhere, and what have the Hindus to fear in Bengal of all places on earth? The idea of domination has to disappear and is disappearing. The British that have dominated India so long have to confess that domination is outmoded and no one race or party can dominate over the other in the face of determination and a will to assert. Where the British have failed, is it possible that any other people in India can succeed?

Once more I find that some Hindu leaders of Bengal are succumbing to the pressure of the Hindus of India and are playing their game that the Hindu leaders, although they know fully well that a partition of Bengal means the doom of Hindu leader of other parts of India who want to utilise Bengal as a pawn in their game and who do not care what happens to the people of Bengal.

Indeed they know fully well that Bengal divided will mean Bengal a prey to the people of other parts of India, a Bengal waiting to be exploited for their benefit.

After everything is said and done I am charged with having

www.pathagar.com

issued threats in the concluding paragraph of my statement where I have referred to Calcutta merely because I have pointed out the dangers. I have only been realistic. I have merely stressed what is well recognised that the cry for partition of Bengal was nothing but an attempt to get the rich prize of Calcutta and they deprive the Muslims of trade and commerce.

But I have equally attemted to point out that a rich prize like this is not easily attained merely by brow-beating statements and if Calcutta becomes a bone of conection what will remain of it? In order that it should be the hub of the economic life of Bengal, it is necessary to have peace and securiy.

Somewhere I have read it remarked that I have parried questions regarding adult franchise and joint electorate. I have never assumed the role of an autocrat with power enough to bind the people of Bengal. I have suggested that the future shape of Bengal will be a matter for negotiation between the Hindu and Muslim leaders to sit down together at a conference to give concrete form to their hopes and aims.

I still extend that invitation to all. I beg of them not destroy Bengal, not to be blinded by wrath and prejudice, or consumed by their hatred for their fellow Bengalees but to look ahead and grasp this wonderful opportunity to make Bengal free and independent, master of its own destiny and its own wealth, capable of a free will to form unions and treaties and and alliances with whomsoever it will, respected amongst the nations of the world, rich, powerful and a heaven for the common man.

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
"স্বাধীন বাংলা" অবাঙালি ও বৃটিশ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখা সম্পাদকীয়।	সাপ্তাহিক 'মিল্লাত'	৯ মে, ১৯৪৭

সম্পাদকীয়

স্বাধীন বাংলা

দুই শত বৎসর পরাধীনতার পর বাঙালি জাতি আজ স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। আর তের মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হইবে। বহু ত্যাগ ও সাধনার পর বাঙালির জীবনে আসিয়াছে এই পরম বাঞ্ছিত শুভক্ষণ।

কিন্তু কি হতভাগ্য এই বাংলাদেশ– বহু প্রতিক্ষীত এবং দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ এমন একটি শুভক্ষণকে ব্যর্থ করিতে আবাঙালি কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্ররোচনায় এই বাংলাদেশেরই একদল স্বার্থান্ধ লোক অতি জঘন্য ষড়যন্ত্রে মাতিয়াছে। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি খণ্ডিত অংশকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের তাবেদাররূপে বাঁধিয়া রাখিতে এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তাহাদের সকল শক্তি ও সামর্থ নিয়োজিত করিয়াছে।

সমগ্র ভারতবর্ষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে মজবুত করিয়া বাঁধিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করিয়াছিল। আর, শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীই বা বলি কেন? বৃটিশের এদেশে আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষ যখনই কোন সাম্রাজ্যবাদীর শাসনাধীনে আসিয়াছে তখনই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের লৌহ নিগড় ভারতের সকল দেশকে শৃংখলাবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য সকল দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেও অতীতে একাধিক সাম্রাজ্যবাদী শত চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে নাই। আর্যদের পদানত হয় নাই। এমন কি অত বড় বড় সব নামকরা সম্রাট মহারাজা অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য তাহারাও কেহ বাংলাদেশকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। গুপ্ত আমল পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা কোন বিদেশীর স্পর্শে কলুষিত হয় নাই।

পালবংশ ও সেনবংশের স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীনে স্বাধীন বাংলা সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হইয়াছিল। মোহাম্মদ বখতিয়ারের বংগ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস বলিতে স্বাধীন বাঙলার ইতিহাসই বুঝায়।

তারপর বিদেশী মুসলমান বাংলাদেশ দখল করিয়া কালক্রমে ইহাকে যখন নিজের দেশ বলিয়া মানিয়া লইল তখন আবার শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের বন্ধন হইতে মুক্তির সংগ্রাম। দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পরই গোড়েশ্বররা দিল্লীর

www.pathagar.com

সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করিতে শুরু করেন। সুলতান আলতামাস দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর 'বিদ্রোহী' বাঙলাকে পুনরায় শৃঙ্খলিত করিলেন বটে কিন্তু গিয়াসউদ্দিন বলবনের আমলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের নিগড় ভাংগিয়া তুগরিল খাঁ আবার বাঙলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিলেন। এই যে, শুরু হইল দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত বাংলাদেশের সংগ্রাম, গোটা পাঠান আমল ও মোগল আমলের শেষ পর্যন্ত এই সংগ্রাম নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিল। ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বলিয়াছেন, 'বাঙলার অধিবাসীদের বিদ্রোহী হওয়ার একটা মজ্জাগত স্পৃহা আছে।' কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হওয়ার এই স্পৃহা বাস্তবিকই বাঙালি চরিত্রের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাঙলার স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে বাঙলাদেশ বরাবর যে লড়াই করিয়াছে সেই লড়াইয়ের ইতিহাসই বাঙলার ইতিহাস। দিল্লীর সাম্রাজ্যকে বাংলাদেশ কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারে নাই।

আর দিল্লীর সম্রাটরাও বাঙলার স্বাধীনতাকে কোনদিনই সহজ চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট ও বাংলার মধ্যে চিরদিন বিরামহীন ও আপোষহীন লড়াই চলিয়াছে। এই লড়াইয়ে কখনও বা পরাজিত হইয়া কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় বন্ধনে বাঙলাদেশ বাঁধা পড়িয়াছে আর কখনও বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে পরাজিত করিয়া বাঙলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে সে উঁচু করিয়া ধরিয়াছে। দিল্লীশ্বর বারবার পাশবিক শক্তিবলে বাঙলার স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু বাংলাদেশ যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছে তখনই মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দিল্লীর রাষ্ট্রীয় বন্ধন ছিড়িয়া বাঙলার আজাদীর পতাকা উড়াইয়াছে।

সমগ্র ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন তাহার একক স্বতন্ত্র একটি সত্তা আছে এই অনুভূতি বাঙলার সহজাত অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রেরণাতেই বাঙলাদেশ দুনিয়ার ইতিহাসে এক গৌরবময় ট্রাডিশন সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লোভ তাহার মনে কখনও স্থান পায় নাই। অপরপক্ষে, লড়াইয়ে পরাজিত না করা পর্যন্ত ভারত সাম্রাজ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলে তাহাকে কখনও বাঁধিতেও পারে নাই।

বাঙালি যে সুমহান ট্র্যাডিশনের ধারক ও বাহক সেই ট্র্যাডিশনের প্রেরণাতেই বাঙলার স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের বাসনা আজ তাহার মনে জাগিয়াছে। অতীতে পরাধীন বাঙলা যখনই লক্ষ্য করিয়াছে, ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট দুর্বল হইয়া পড়িতেছে তখনই সে কেন্দ্রের তাবেদারী অস্বীকার করিয়া বাঙালার সার্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে চলিয়াছে। তাই ভারত হইতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সংগে সংগে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাংলাদেশ তাহার ট্র্যাডিশনকে সমগ্র জগতের সম্মুখে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা, এক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থবাদী দেশদ্রোহীর ভূমিকায়

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হইয়া বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহার একটি অংশকে বিদেশীর হাতে তুলিয়া দিতে গভীর ষড়যন্ত্র করিতেছে। অবাঙালিদের প্রতি বিদ্বেষের কথা বাড়ীর পাশে বিহার ও আসামে কংগ্রেস ওজারতীর আমলে প্রবাসী বাঙালির উপর অত্যাচার ও অবিচারের কথা, অবাঙালি কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে বাঙলার হিন্দু নেতাদের অপমানের কথা-সব কথাই ষড়যন্ত্রকারীদের জানা আছে; তবু তাহারা বিদেশী ধনিক-বণিকদের প্রেরণায় বাঙলাদেশের একটি অংশকে বিদেশীর উপনিবেশে রূপান্তরিত করিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালি হইয়াও যাহারা বাঙলা দ্বিখণ্ডিত করার পক্ষে ও বাঙলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিয়াছে তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতে চাই। বাঙালির রক্ত শোষণ করিয়া যাহারা বিত্ত সঞ্চয় করিয়াছে তাহারা আজ অকস্মাৎ এমন পরোপকারী হইয়া উঠিল কেন? বংগ ভংগ আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে তাহারা দুই হাতে পানির মত অর্থ ব্যয় করিতেছে কেন? এই কেন'র কি কোন জওয়াব নাই? জওয়াব আছে। আর সেই জওয়াবের ভিতরেই বংগভংগ আন্দোলনের সকল গূঢ় রহস্য নিহিত।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রবাসী বাঙালিদের উপর যে নির্যাতন চলিতেছে সেই নির্যাতনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগীয় সাহিত্য সম্মেলনে যে সব তীব্র মন্তব্য ও প্রস্তাবাদি পাশ করা হইয়াছে তাহা সবারই জানা আছে। কিন্তু সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও বাঙলার ট্রাডিশনকে পদদলিত করিয়া অখণ্ড ভারতের তাবেদাররূপে বাঙলার একটি অংশকে বাঁধিয়া রাখার জন্য গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বাঙালি আজ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের এই ক্ষেপামীর ফলে বাঙালির জীবনে যে কি ভয়াবহ অভিশাপ দেখা দিতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করিব।

পরিশিষ্ট ৫

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবিত কাঠামো।	ইন রেট্রেসপেকশন ঃ আবুল হাশিম, পৃষ্ঠা ১৫৮।	২৩ মে ১৯৪৭

The following is the text of the tentative agreement signed by Sarat Chandra Bose and myself :

I. Bengal will be a free state. The free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. The Constitution of the free Bengal will provide for elec-

www.pathagar.com

tion to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and scheduled castes Hindus will be distributed amongst them in proportion of their respective population or in such manner as may be agreed among them. The Constituencies will be multiple Constituences and votes will be distributed and not cumulative. A candidate who gets majority of the votes of his own community cast during election and 25% of the votes of the other communities so casts will be declare elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected.

3. On the annonuncement by His Majesty's Government that the proposal of the free State of Bengal has been accepted and that Bengal will not be parrtioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new interim Ministry brought into being consisting of an equal members of Muslims and Hindus (including scheduled casted Hindus) but cxcluding the Chief Minister. In this Ministry the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu.

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under the new Constitution, the Hindus (including scheduled castes Hindus) and the Muslims will have an equal share in the services including Military and police. The services will be manned by Bengalees.

5. A Constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Muslims and 14 Hindus, will be elected by Muslims and non-Muslims members of the Legislature respectively, excluding the Europeans.

1 Woodburn Park. Sd. Sarat Chandra Bose
Calcutta. Sd. Abdul Hashim.
20th may, 1947.

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
গান্ধী কর্তৃক শরৎ বোসকে লিখিত চিঠিতে প্রকাশিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার প্রতি কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাব।	ইন রেট্রসপেকশন ঃ আবুল হাশিম, পৃষ্ঠা ১৫৮।	৮ জুন, ১৯৪৭

Mr. Gandhi wrote to Mr. Sarat Chnadra Bose on the 8th June, 1947 :

My dear Sarat,

I have gone through your draft. I have now discussed the scheme roughly with Pundit Nehru and Sardar. Both of them are dead against the proposal and they are of opinion that it is merely a trick for dividing Hindus and Scheduled Caste leaders. With them it is not a suspicion but almost a conviction. They feel also that money is being lavishly expended in order to secure Schedule Caste votes. If such is the case you should give up the struggle at least at present. For the unity purchased by corrupt practices, would be worse than a frank partition, it being a recognition of the established division of hearts and the unfortunate experiences of Hindus. I see also that there is no prospect of a transfer of power outside the two parts of India. Therefore, whatever arrangement is come to, has to be arrived at by a previous agreement between the Congress and the League. This as far as I can see, you cannot obtain. Nevertheless, I would not shake your faith unless it is founded on shifting sand consisting of corrupt practices and trickery alluded to above. If you are absolutely sure that there is not warrant whatsoever for the suspicion and unless you get the written assurance of the local Muslim League supported by the Centre, you should give up the struggle for unity of Bengal and cease to disturb the atmosphere that has been created for partition of Bengal.

Lovingly
Bapu.

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৭

৩ রা জুনের ঘোষণার ভিত্তিতে বঙ্গীয় আইন পরিষদের অধিবেশনে অখন্ড বাংলা ও নতুন গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে যে ১২৬ জন ভোট প্রদান করেন তাদের নাম ঃ-

ডা. আব্দুল আহাদ
মাওলানা মোঃ আব্দুল আজীজ
মুন্সী আব্দুল আজিজ
মীর্জা আব্দুল হাফিজ
মাওলানা আব্দুল হাই
আব্দুল হাকিম মিয়া
মোঃ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী
মোল্লা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম
আব্দুল হামিদ
এ. এম. আব্দুল হামিদ
আব্দুল হান্নান
আব্দুল করিম
আব্দুল খালেক
ফকির আব্দুল মান্নান
আব্দুল মোমিন
আব্দুল ওয়াহিদ সরকার
মোঃ আব্দুল্লাহ হেল বাকী
এ. এফ. এম. আব্দুর রহমান
আব্দুর রহমান খান (নুরু মিয়া)
আব্দুর রশিদ মাহমুদ
মাওলানা খন্দকার আব্দুর রশিদ তর্কবাগীস
সৈয়দ আব্দুর রউফ
আব্দুস সবুর খান
মোঃ আব্দুস সালাম
আবিদুর রেজা চৌধুরী
আবুল হাশেম
আবুল কালাম শামসুদ্দিন
কাজি আবুল মাসুদ
মীর আহমদ আলী
আহমেদ আলী মৃধা
আহমেদ হোসাইন
আহমেদ কবির চৌধুরী
মৌলভী আকবর আলী
আলী আহমেদ চৌধুরী
আলী আহমেদ খান
আনোয়ারা খাতুন
মোঃ আরিফ চৌধুরী (ধনু মিয়া)
আহসান আলি মোক্তার
আওলাদ হোসাইন খান
সৈয়দ আজিজুর রহমান
বদিউজ্জামান মুহাম্মদ ইলিয়াস
এ. কে এম বফত উদ্দিন তালুকদার
হারান চন্দ্র বর্মন (তফশিলী)
দ্বারকানাথ বারুই (তফশিলী)
ভোলানাথ বিশ্বাস (তফশিলী)
গয়ানাথ বিশ্বাস (তফশিলী)
ইব্রাহিম খান
ইমাদ উদ্দিন আহম্মদ
ইস্কান্দার আলী খান
ফরিদ আহমদ চৌধুরী
ফজলুল করিম
ফজলুল কাদের চৌধুরী
ফজলুর রহমান (ঢাকা)
ফজলুর রহমান (ময়মনসিংহ)
ফজলুর রহমান (নোয়াখালী)
আর এ গমেস
সৈযদ হাবিবুল হক
হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী
হামিদ উদ্দিন আহমেদ
হাসান আলী

www.pathagar.com

খান সাহেব হাতেম আলী
হোসনে আরা বেগম
ইলিয়াস আলী মোল্লা
এম. এ. এইচ ইসপাহানী
জসিম উদ্দিন আহমেদ
জনাব আলী মিয়া
কবির আহমেদ চৌধুরী
কাজেম আলী মীর্জা
খয়রাত হোসাইন
খোদা বক্স
খুররম খান পন্নী
লুৎফর রহমান
দেওয়ান লুৎফর রহমান
মাদার বক্স
মফিজ উদ্দিন আহমেদ
সৈয়দ মুহাম্মদ আফজাল
মুহাম্মদ ওয়াইস
মোহাম্মদ সাইদ মিয়া
মৌলভী মজিবর রহমান
ড. এ এম. মালিক
মনিরুদ্দিন আকন্দ
মর্তুজা রেজা চৌধুরী
মসিহ উদ্দিন আহমেদ (রাজা মিয়া)
এ. টি মাজহারুল হক
মোবারক আলী আহমেদ
মোহাম্মদ শরীফ খান
মোহাম্মদ আলী
ড. মোজাম্মেল হোসাইন
মুদাস্‌সির হোসাইন
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী
মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রিস
মুহাম্মদ ইসহাক
মুহাম্মদ ইসরাইল
মাওলানা হাজি মুহাম্মদ কাশেম
মোহাম্মদ কামরুদ্দিন
মুহাম্মদ রফিক
মুহাম্মদ রুকন উদ্দিন
ড. সৈয়দ মুহাম্মদ সিদ্দিক
নওয়াব খান বাহাদুর মোশাররফ হোসেন
মুজাফফর রহমান চৌধুরী
মোঃ নাজমুল হক
কে নসরুল্লাহ
নওয়াজেস আহমেদ
নওয়াব আলী
নাজির হোসাইন খন্দকার
কে নুরুউদ্দিন
নুরুজ্জামান
নুরুল আমিন
ওসমান আলী
মোঃ ওসমান গনি
পনির উদ্দিন আহমেদ
নগেন্দ্র নারায়ণ রায়
এস. এ. সেলিম
সৈয়দ সিরাজুল হক
সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (মেদিনীপুর)
সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (গাইবান্ধা)
সিরাজুল ইসলাম
শামসুদ্দিন আহমেদ (মন্ত্রী)
শামসুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী (বাদশা মিয়া)
খোন্দকার শামসুদ্দিন আহমেদ
মোঃ শামসুদ্দিন শিকদার
শরফুদ্দিন আহমেদ
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
তোফাজ্জল হোসাইন
ইউসুফ হোসেন চৌধুরী
এ. এম এ জামান

www.pathagar.com

৯০ জন সদস্য ভারতীয় গণপরিষদে যোগদানের পক্ষে ভোট দেন

সিতাংশ কান্ত আচার্য
অমূল্যচন্দ্র অধিকারী
প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়
গোবিন্দলাল ব্যানার্জী
শিবনাথ বানার্জী
সুশীল কুমার ব্যানার্জী
ড. সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী
মোহিনী মোহন বর্মণ
হেমন্ত কুমার বসু
চারুচন্দ্র ভান্ডারী
জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য
মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
বীর বীরশাহ
সতীশচন্দ্র বসু
বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী
হরিপদ চ্যাটার্জী
মিহিরলাল চট্টপাধ্যায়
আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী
বীণা দাস
ব্রজ মাধব দাস
যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস
রাধানাথ দাস
খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
সুরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত
কানাইলাল দাশ
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
কানাইলাল দে
মনোরঞ্জন ধর
হরেন্দ্রনাথ ধলুই
সুকুমার দত্ত
নিহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার
বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী
অরবিন্দু গায়েন
এ.কে ঘোষ
বিমল কুমার ঘোষ
হারানচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী
ডি গোমেজ
ড. প্রতাপচন্দ্র গুহরায়
মনোরঞ্জন গুপ্ত
দুস্বর সিং গুরুং
কুবের চাঁদ হালদার
ইশ্বর দাস জালান
দেবীপ্রসাদ খায়তন
নিশিথ নাথ কুন্ডু
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
চারুচন্দ্র মহান্তী
উদয়চাঁদ মাহতাব মহারাজাধিরাজ বাহাদুর (বর্ধমান)
নিকুঞ্জবিহারী মাইতী
নিশাপতি মাঝি
ভূপতি মজুমদার
ইশ্বরচন্দ্র মাল
আশুতোষ মল্লিক
আনন্দ প্রসাদ মন্ডল
বঙ্কবিহারী মন্ডল
কৃষ্ণপ্রসাদ মন্ডল
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
কালিপদ মুখার্জি
ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি
মুকুন্দ বিহারী মল্লিক
বসন্তলাল মুরারকা
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী
অর্ধেন্দু শেখর নস্কর

www.pathagar.com

হেমচন্দ্র নস্কর
জাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
এল আর পেন্টনী
আর ই প্লাটেল
আনন্দলাল পোদ্দার
পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক
রজনীকান্ত প্রামাণিক
জগনেশ্বর রায়
কমলকৃষ্ণ রায়
ই এম. রিকেটস
ধনঞ্জয় রায়
হরেন্দ্রনাথ রায়
ড. কিরণ শঙ্কর রায়

রাম হরি রায়
বিজয়কৃষ্ণ সরকার
রাজেন্দ্রনাথ সরকার
প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার
আশালতা সেন
দেবেন্দ্রনাথ সেন
সতীন্দ্রনাথ সেন
নেলীসেন গুপ্তা
অরুণচন্দ্র সিংঘা
নরেন্দ্র সিং সিংঘী
বিমলচন্দ্র সিংহা
প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর
জি. সি. ডি উইলকস

www.pathagar.com

১৯৪৭ সালের ২০ জুন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহের কংগ্রেস সদস্য, হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু সহ ৫৮ জন বিধায়ক বাংলা ভাগের পক্ষে এবং ২১ জন সদস্য বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন।

বাংলা ভাগের পক্ষে ৫৮ জন ভোট প্রদানকারী বিধায়কদের নাম ঃ-

জ্যোতি বসু

গোবিন্দলাল ব্যানার্জী
প্রমথনাথ ব্যানার্জী
শিবনাথ ব্যানার্জী
সুশীল কুমার ব্যানার্জী
সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী
মোহিনী মোহন বর্মন
হেমন্ত কুমার বসু
জ্যোতি বসু
চারুচন্দ্র ভান্ডারী
সতীশচন্দ্র বসু
রতন লাল ব্রাহ্মণ
মিহির লাল চট্টপাধ্যায়
আনন্দ প্রসাদ চৌধুরী
বীণা দাস
রাধানাথ দাস
খগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
কানাইলাল দাস
কানাইলাল দে
হরেন্দ্রনাথ ধলুই
সুকুমার দত্ত
নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার
বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী
অরবিন্দ গায়েন
এ. কে ঘোষ
বিমল কুমার ঘোষ
ডি গোমেস
দুম্বর সিং গুরুং
ইশ্বর দাস জালন
দেবীপ্রসাদ খায়তন
চারুচন্দ্র মহান্তী
স্যার উদয় চাঁদ মাহতাব
নিকুঞ্জবিহারী মাইতী
নিশাপতি মাঝি
ভূপতি মজুমদার
ঈশ্বরচন্দ্র মাল
আশুতোষ মল্লিক
আনন্দ প্রসাদ মন্ডল
বংকুবিহারী মন্ডল
কৃষ্ণ প্রসাদ মন্ডল
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি
ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি
কালিপদ মুখার্জি
মুকুন্দবিহারী মল্লিক
বসন্তলাল মুরারকা

www.pathagar.com

অর্ধেন্দু শেখর নস্কর
হেমচন্দ্র নস্কর
জাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা
এল আর পেন্টনী
আর, ই, প্লেটেল
আনন্দলাল পোদ্দার
রজনীকান্ত প্রামাণিক
কমলকৃষ্ণ রায়
যোগেনেশ্বর রায়
মিসেস ই. এম. রিকেটস
রাজেন্দ্রনাথ সরকার
দেবেন্দ্রনাথ সেন
বিমলচন্দ্র সিংহা
জিসি ডি উইলকস

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা সমূহের ২১ জন বিধায়ক বাংলা ভাগের বিপক্ষে ভোট প্রদান করেন ঃ

আব্দুল আহাদ
এ. এফ. এম. আব্দুর রহমান
আব্দুস সবুর খান
আবুল হাশেম
হোসনে আরা বেগম
ইলিয়াস আলি মোল্লা
এম. এ. এইচ ইস্পাহানী
জসিমুদ্দিন আহমেদ
মোহাম্মদ শরীফ খান
মোজাম্মেল হোসাইন
মুদাস্‌সির হোসাইন
মুহাম্মদ ইদ্রিস
মুহাম্মদ কামরুদ্দিন
মুহাম্মদ রফিক
সৈয়দ মুহাম্মদ সিদ্দিক
মোশাররফ হোসাইন
কে. নুরু উদ্দিন
সেরাজ উদ্দিন আহমেদ (মেদিনীপুর)
এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী
এ. এম. এ. জামান
আব্দুল ওয়াহিদ সরকার

www.pathagar.com

বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের ১০০ জন লীগ সদস্য, তফসিলী ফেডারেশনের ৫ জন বিধায়ক এবং ১ জন খৃস্টান সদস্য বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে এবং ৩৫ জন কংগ্রেস সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন।

বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে অর্থাৎ বাংলাকে অবিভক্ত রাখার পক্ষে ভোট প্রদানকারী ১০৫ জন সদস্যের নাম ঃ

মাওলানা মোঃ আব্দুল আজীজ (নারায়ণগঞ্জ পূর্ব)
মুন্সী আব্দুল আজীজ (মাদারীপুর)
মীর্জা আব্দুল হাফিজ (টাঙ্গাইল পশ্চিম)
মাওলানা আব্দুল হাই (নোয়াখালী)
মিয়া আব্দুল হাকিম (নোয়াখালী পশ্চিম)
মোঃ আব্দুল হাকিম বিক্রমপুরী (মুন্সীগঞ্জ)
মোল্লা মোহাম্মদ আব্দুল হালিম (নদীয়া পশ্চিম)
আব্দুল হামিদ (রাজশাহী দক্ষিণ)
এ. এম. আব্দুল হামিদ (পাবনা পশ্চিম)
আব্দুল হান্নান (মেহেরপুর)
আব্দুল করিম (জামালপুর)
মৌলভী আব্দুল খালিক (ঢাকা দক্ষিণ)
ফকির আব্দুল মান্নান (ঢাকা উত্তর)
আব্দুল মোমিন (ত্রিপুরা)
মাওলানা মোঃ আব্দুল্লাহহেল বাকি (দিনাজপুর)
আব্দুর রহমান খান নুরু মিয়া (পটুয়াখালী উঃ)
আব্দুর রশিদ মাহমুদ (সিরাজগঞ্জ)
মাওঃ খন্দকার আব্দুর রশিদ তর্কবাগীস (সিরাজগঞ্জ)
সৈয়দ আব্দুর রউফ (যশোর পূর্ব)
মোঃ আব্দুস সালাম (মতলব বাজার)
মৌলভী আবিদুর রেজা চৌধুরী (চাঁদপুর পশ্চিম)
আবুল কালাম শামসুদ্দিন (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
কাজি আবুল মাসুদ (নাটোর)
মীর আহাম্মদ আলী (জামালপুর মুক্তাগাছা)
আহমেদ আলী মৃধা (গোয়ালন্দ)

www.pathagar.com

আহমেদ হোসাইন (গাইবান্ধা দক্ষিণ)
আহমেদ কবীর চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
মৌলভী আকবর আলী (নেত্রকোনা উত্তর)
আলী আহমেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)
আলী আহমেদ খান (বাক্ষণবাড়িয়া দক্ষিণ)
আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা-মহিলা)
মোঃ আরিফ চৌধুরী (ধনু মিয়া) (বাকেরগঞ্জ উত্তর)
আহসান আলী মোক্তার (নেত্রকোনা দক্ষিণ)
আওলাদ হোসাইন খান (মানিকগঞ্জ পূর্ব)
সৈয়দ আজিজুর রহমান (ভোলা দক্ষিণ)
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান ইলিয়াস (বগুড়া পূর্ব)
এ.কে.এম. বফতউদ্দিন তালুকদার (জামালপুর পঃ)
হারান চন্দ্র বর্মন (বগুড়া-পাবনা)
দ্বারকানাথ বারুই (ফরিদপুর তফসিলি)
ড. ভোলানাথ বিশ্বাস (যশোর তফসিলি)
গয়ানাথ বিশ্বাস (ময়মনসিংহ)
মৌলভী ইব্রাহিম খান (টাঙ্গাইল উত্তর)
ইমাদ উদ্দিন আহমদ (রংপুর দক্ষিণ)
ইস্কান্দার আলী খান (মাদারিপুর পশ্চিম)
ফরিদ আহমদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম উত্তর-পূর্ব)
ফজলুল করিম (রামগঞ্জ রায়পুর)
ফজলুল কাদির চৌধুরী (চট্টগ্রাম উত্তর-পূর্ব)
ফজলুর রহমান (ঢাকা)
ফজলুর রহমান (ময়মনসিংহ-জামালপুর পূর্ব)
ফজলুর রহমান (নোয়াখালী)
আর এ গোমেস (ঢাকা বিভাগ-খ্রিষ্টান)
সৈয়দ হাবিবুল হক (কিশোরগঞ্জ)
হাফিজ উদ্দিন চৌধূরী (ঠাকুরগাঁও)
হামিদ উদ্দিন আহমেদ (কিশোরগঞ্জ পূর্ব)
হাসান আলী (দিনাজপুর মধ্য-পশ্চিম)
খান সাহেব হাতেম আলী (পিরোজপুর দক্ষিণ)
জনাব আলী মিয়া (চাঁদপুর পূর্ব)
কবির আহমেদ চৌধুরী (কক্সবাজার)

www.pathagar.com

সাহেবজাদা মীর্জাকাজেম আলী (মুর্শিদাবাদ দঃ-পঃ)
খয়রাত হোসাইন (নিলফামারী)
মোঃ খুদা বখস (বহরমপুর)
খুররম খান পন্নী (টাঙ্গাইল দক্ষিণ)
লুৎফুর রহমান (যশোর সদর)
দেওয়ান লুৎফর রহমান
মাদার বকস্ (রাজশাহী কেন্দ্রীয়)
মফিজ উদ্দিন আহমেদ (ত্রিপুরা-উত্তর)
সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল (পিরোজপুর উত্তর)
মোহাম্মদ ওয়াইস (রংপুর)
মোহাম্মদ সাঈদ মিয়া
মজিবুর রহমান (নোয়াখালী কেন্দ্রীয়)
ডা. এ এম. মালিক (শ্রমিক নেভাল ট্রেড ইউনিয়ন)
মনির উদ্দিন আখন্দ (রাজশাহী উত্তর)
মোর্তজা রেজা চৌধুরী (জঙ্গীপুর)
মসিহউদ্দিন আহমেদ রাজা মিয়া (মানিকগঞ্জ পঃ)
আবু তৈয়ব মাজহারুল হক (ঢাকা কেন্দ্রীয়)
মোবারক আলী আহম্মেদ (বগুড়া উত্তর)
মোহাম্মদ আলী (বগুড়া পশ্চিম)
মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ চৌধুরী (ফেনী)
মুহাম্মদ ইসহাক (বগুড়া দক্ষিণ)
মুহাম্মদ ইসরাইল (কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ)
মাওলানা হাজি মুহাম্মদ কাশেম (বাকেরগঞ্জ পশ্চিম)
মুহাম্মদ রুকন উদ্দিন (বাক্ষণবাড়িয়া)
মোজাফফর রহমান চৌধুরী (বালুরঘাট)
মোঃ নাজমুল হক (মালদহ দক্ষিণ)
কে নসরুল্লাহ (ঢাকা পৌরসভা এলাকা)
নওয়াব আলী (ত্রিপুরা পশ্চিম)
নওয়াজেস আহমেদ (নদীয়া পূর্ব)
নাজির হোসাইন খন্দকার (কুড়িগ্রাম দক্ষিণ)
নুরুজ্জামান (ভোলা উত্তর)
নুরুল আমিন (ময়মনসিংহ পূর্ব)
ওসমান আলি (নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ)

www.pathagar.com

মোঃ ওসমান গনি (সিরাজগঞ্জ উত্তর)
পনির উদ্দিন আহমেদ (কুড়িগ্রাম উত্তর)
নগেন্দ্র নারায়ণ রায় (রংপুর তফসিলি)
এস. এ সেলিম (নারায়ণগঞ্জ দক্ষিণ)
সৈয়দ সেরাজুল হক (ত্রিপুরা দক্ষিণ)
সেরাজ উদ্দিন আহমদ (গাইবান্ধা)
সেরাজুল ইসলাম (বনগাঁও)
শামসুদ্দিন আহমদ (কুষ্টিয়া)
শামসুদ্দিন আহমদ চৌধুরী বাদশা মিয়া (ফরিদপুর পূর্ব)
খোন্দকার শামসুদ্দিন আহমদ (গোপালগঞ্জ)
মোঃ শামসুদ্দিন শিকদার (পটুয়াখালী দক্ষিণ)
শরফুদ্দিন আহমেদ (ময়মনসিংহ উত্তর)
তোফাজ্জল আলী (ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব)
তোফাজ্জল হোসাইন (ঝিনাইদহ)
ইউসুফ হোসাইন চৌধুরী মোহন মিয়া (ফরিদপুর)

www.pathagar.com

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার যে ৩৫ জন কংগ্রেস সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দেন তাদের নাম ঃ-

সিতাংশ কান্ত আচার্য (ঢাকার জমিদার)
অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (ময়মনসিং সাধারণ)
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (ঢাকা পূর্ব)
মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ঢাকা পশ্চিম)
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য (মুর্শিদাবাদ)
বীর বীরশাহ (মালদহ তফসিলি)
বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ পশ্চিম)
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)
হরিপদ চ্যাটার্জী
ব্রজমাধব দাস (রংপুর)
যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস (ত্রিপুরা)
সুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (ত্রিপুরা কুমিল্লা)
মনোরঞ্জন ধর (উত্তরবঙ্গ পৌরসভা)
হারানচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী (নোয়াখালী)
ড. প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় (ফরিদপুর)
মনোরঞ্জন গুপ্ত (বাকেরগঞ্জ উত্তর-পূর্ব)
কুবের চাঁদ হালদার (মুর্শিদাবাদ তফসিলি)
নিশিথনাথ কুন্ড (দিনাজপুর)
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজশাহী)
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী (জমিদার, কাশিমবাজার)
পূর্ণচন্দ্র প্রামাণিক (নদীয়া)
ধনঞ্জয় রায় (ঢাকা পূর্ব)
হরেন্দ্রনাথ রায় (দিনাজপুর)
কিরণ শঙ্কর রায় (পূর্ববঙ্গ পৌরসভা)
রাম হরি রায় (মালদহ)
রূপ নারায়ণ রায় (দিনাজপুর তফসিলি)
বিজয় কৃষ্ণ সরকার (যশোর)
প্রফুল্ল রঞ্জন সরকার (ময়মনসিংহ পূর্ব)
আশালতা সেন (ঢাকা-মহিলা)
সতীন্দ্রনাথ সেন (বাকেরগঞ্জ দক্ষিণ-পশ্চিম)
নেলী সেন গুপ্তা (চট্টগ্রাম-মহিলা)
নরেন্দ্র সিং সিংগি
কুমার অরুণ চন্দ্র সিংহ (চট্টগ্রাম, জমিদার)
প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর (ফরিদপুর তফসিলি)

www.pathagar.com

শিরোনাম	সূত্র	তারিখ
পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ঘোষণা ঃ র‍্যাডক্লীফ রোয়েদাদ।	পাকিস্তান রেজোলিউশন টু পাকিস্তান ঃ পৃষ্ঠা– ২৬১।	১২ ই আগষ্ট, ১৯৪৭।

REPORT BY THE CHAIRMAN OF THE BENGAL BOUNDARY COMMISSION

To

HIS EXCELLENCY THE GOVERNOR-GENERAL

1. I have the honour to present the dicision and award of the Bengal Boundary Commission which, by virtue of section 3 of the Indian Independence Act, 1947, is represented by my decision as chairman of that Commission. This award relates to the division of the Province of Bengal, and the Commission's award in respect of the District of sylhet and areas adjoining thereto will be recorded in a separate report.

2. The Bengal Boundary Commission was constituted by the announcement of the Governor-General dated the 30th of June, 1947, Reference No. D. 50/7/47 R. The members of the Commission thereby appointed were ---

Mr. Justice Bijan Kumar Mukherjee

Mr. Justice C. C. Biswas,

Mr. Justice Abu Saleh Mohammed Akram, and

Mr. Justice S. A. Rahman.

I was subsequently appointed Chairman of this Commission.

3. The terms of reference of the Commission , as set out in the announcement, were as follows.

"The Boundary Commission is instructed to demarcate the

www.pathagar.com

boundaries of the two parts of Bengal on the basis of ascertaining the contiguous areas of Muslims and non-Muslims, In doing so, it will also take account other factors."

We were desired to arrive at a decision as soon as possible before the 15th of August.

4. After prelimenary meetings, the Commission invited the submission of memoranda and representations by interested parties. A very large number of memoranda and representations was received.

5. The public sitting of the Commission took place at Calcutta, and extended from Wednesday the 16th of July 1947 to Thursday the 24 of July 1947, inclusive, with the exception of Sunday, the 20th of July. Arguments were presented to the Commission by numerous parties on both sides, but the main cases were presented by counsel on behalf of the Indian National Congress, the Bengal Provincial Hindu Mahasabha and the New Bengal Association on the one hand, and on behalf of the Muslim league on the other. In view of the fact that I was acting also as chairman of the Punjab boundary Commission, whose proceedings were taking place simultaneously with the proceeding of the Bengal Boundary Commission, I did not attend the public sittings in person, but made arrangements to study daily the record of the proceedings and all material submitted for our consideration.

6. After the close of the public sittings, the remainder of the time of the Commission was devoted to clarification and discussion of the issues involved. Our discoussion took place at Calcutta.

7. The question of drawing a satisfactory boundary line under our terms of reference between East and West Bengal was one to which the parties concerned propunded the most diverse solutions. The province offers few, if any, satisfactory natural boundaries, and its development has been on lines that do not

www.pathagar.com

well accord with a division by contiguous majority areas of Muslim and non-Muslim majorites.

8. In my view, the dimarcation of a boundary line between East and West Bengal depended on the answers to be given to certain basic questions which may be stated as follows :

(1) To which State was the City of Calcutta to be assigned, or was it possible to adopt any method of dividing the City between the two States.

(2) If the City of Calcutta must be assigned as a whole to one or other of the States, what were its indispensable claims to the control of territory, such as all or part of the Nadia River system of the Kulti river, upon which the life of Calcutta as a city and port depended?

(3) Could the attractions of the Ganges-Padma-Madhumati river line displace the strong claims of the heavy concentration of Muslim majorities in the districts of Jessore and Nadia without doing too great a violence to the principle of our terms of reference?

(4) Could the district of Khulna usefully be held by a State different from that which held the district of Jessore?

(5) Was it right to assign to Eastern Bengal the considerable block of non-Muslim majorities in the districts of Malda and Dinajpur?

(6) Which States claim ought to prevail in respenct of the Districts of Darjeeling and Jalpaigury, in which the Muslim population amounted to 2.42 per cent of the whole in the case of Darjeeling, and to 23.08 per cent. of the whole in the case of Jalpaiguri, but which constituted an area not in any natural sense contiguous to another non-Muslim area of Bengal?

(7) To which State should the Chittagong Hill Tracts be assigned, an area in which the Muslim population was ony 3 per cent. of the whole, but which it was difficult of assign to a State different from that which controlled the district of Chittagong itself?

www.pathagar.com

(8) After much discussion, my collegues found that they were unable to arrive at an agreed view on any of these major issues. There were of course considerable areas of the porvice in the south-west and north-east and east, which provokes no controversy on either side; but, in the absence of any reconciliation on all main questions affecting the drawing of the boundary itself, my colleagues assented to the view at the close of our discussions that I had no alternative but to proceed to give my own decision.

(9) This I now proceed to do: but I should like at the same time to express my gratitude to my colleagues for their indispensable assistance in clarifying and discussing the difficult question involved. The demarcation of the boundary line is described in detail in the schedule which forms Annexure A to this award, and in the map attached theroto, Annexure B. The map is between for purposses of illustration, and if there should be any divergence map between the boundary as descrived in Annexure A and as delineated on the map in Annexure B, the description in Annexure A is to prevail.

(10) I have done what I can in drawing the line to eliminate any avoidable cutting of railway communications and or river system, which are of importance to the life of the province : but it is quite impossible to draw a boundary under our terms of refernce without causing some interruption of this sort, and I can only express the hope that arrangements can be made and maintained between the two States that will minimize the consequences of this interruption as far as possible.

New Delhi;
12th August, 1947.

(Signed) CYRIL RADCLEFFE

www.pathagar.com

সাহায্যকারী গ্রন্থ ঃ

১। পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর- তোফাজ্জল হোসেন (মানিকমিয়া) শিখা প্রকাশনী-একুশে বই মেলা ২০০৩)

২। পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন- মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৩। পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা- নিতাই দাস, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩।

৪। আমি স্মৃতি আমি ইতিহাস- মোজহারুল ইসলাম, বুক সোসাইটি, অক্টোবর ১৯৭৪।

৫। বাংলাদেশের তারিখ- মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ২০০১।

৬। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ- আবু আল সাঈদ, আগামী প্রকাশনী, জানুয়ারী ১৯৯৯।

৭। বাংলাদেশের ইতিহাস(১৯৪৭-৭১)- ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, সময় প্রকাশন, অক্টোবর ১৯৯৯।

৮। বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার বৃহত্তর দিনাজপুর, ১৯৯১।

৯। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম-অধ্যাপক আবদুল গফুর, জ্ঞান বিতরণী, একুশে বইমেলা, ২০০৫।

১০। মন মানুষের খোঁজে- অতুল পাল, রুদ্রলোক প্রকাশন পশ্চিমবঙ্গ, বাংলা-১৪১০।

১১। মাতৃ বাংলা-বঙ্গরত্ন, মুক্তবঙ্গ প্রকাশনী, পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা।

১২। বাঙলা ভাগ হল- জয়া চ্যাটার্জী, অনুবাদ আবু জাফর, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি, ২০০৩।

১৩। ভারত বিভক্তি ও বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা- একে এম রফিক উল্লাহ চৌধুরী, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা, প্রকাশকাল- মে, ১৯৯৬।

১৪। ইতিহাস কথা কয়- মোহাম্মদ মোদাব্বের, নতুন ধারা-৩৮/২ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

১৫। আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলার রাজনীতি; আবুল হাশিম, ঢাকা, ১৯৮৭।

১৬। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়- লিওনার্দ মোজলে, অনুবাদ-মোয়াজ্জম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।

১৭। চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহমাদ মোর্তজা, বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, মদীনা মার্কেট, মেমারী, বর্ধমান, অষ্টম মুদ্রণ-২০০০

১৮। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ, সম্পাদনা-রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি বইমেলা, ১৯৯৮

১৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিল পত্র (১ম খন্ড) সম্পাদনা- মাহমুদ উল্লাহ ২৬ মার্চ, ১৯৯৯।

২০। বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রকাশকাল- মার্চ ২০০৩।

২১। The Great Divide Hodson.

২২। বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, এ.টি.এম আতিকুর রহমা বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মুহাম্মদ আসাদ একজন সাংবাদিক, শিক্ষক, ইতিহাস-গবেষক ও সমাজসেবক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বাংলা ১৩৫১ সালের ৭ কার্তিক মানিকগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতার নাম মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ এবং মাতার নাম জরিমননেছা বেগম। মুহাম্মদ আসাদ জয়নগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করেন। ১৯৭১ সালে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম.এ পাস করেন।

পাকিস্তান অবজারভার (পরবর্তীকালে বাংলাদেশ অবজারভার) (১৯৬৬-৭৫); দৈনিক পূর্বদেশ (১৯৬৯-৭২); সাপ্তাহিক চিত্রালী (১৯৯০); সাপ্তাহিক বিশ্ববাংলা (১৯৯১) প্রভৃতি পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। মুহাম্মদ আসাদ ১৯৮৫ সালে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বর্তমানে তিনি সাপ্তাহিক দিগদিগন্ত পত্রিকার সম্পাদক।

১৯৭০ সালে মুহাম্মদ আসাদ তাঁর নিজগ্রামে জয়নগর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি এ স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বর্তমানে স্কুলটি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৭৪-৭৫ সালে আরামবাগ গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৫ সালে ২২ ডিসেম্বর তিনি ইন্সটিটিউট অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ- এ চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পরীক্ষা সংক্রান্ত অফিসার ছিলেন। ১৯৮৯ সালে তিনি শেফা কল্যাণ ট্রাস্টের সেক্রেটারী পদে চাকুরী করেন। ১৯৯২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত তিনি মর্ডাণ ফুডের জনসংযোগ কর্মকর্তা ছিলেন।

তিনি অসংখ্য সংকলন সম্পাদনা করেন। এ পর্যন্ত তাঁর নিজের ১০ (দশ) টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো- ভূট্টোর ফাঁসি (১৯৭৯); নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ (বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা (ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫); বাংলাদেশে ইসলামের ইতিকথা (১৯৯৯); ঐতিহ্য অন্বেষা; বাংলাদেশের ইতিহাস।

তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে জড়িত। তিনি বাংলাদেশ মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাধারণ সম্পাদক এবং পূর্ণিমা বাসরের পরিচালক। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে তার অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে অসংখ্য সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন।